তিন বন্ধু
পাগলের গুপ্তধন
রকিব হাসান

পরিচয়

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা–
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান–ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো। অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড–বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

নতুন আরেকটা রহস্যের সমাধান করতে চলেছি।
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

এক

গোবেল বীচে জিনাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে তিন গোয়েন্দা। সাগরের কিনারের রাস্তা ধরে সাইকেল চালিয়ে চলেছে। সুন্দর দিন, চমৎকার রোদ। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে জিনা রয়েছে। জিনার সাইকেলের ক্যারিয়ারে চেপে চলেছে ওর প্রিয় কুকুর রাফিয়ান। একটা পুরানো দুর্গ দেখতে চলেছে ওরা।

'কি যেন নাম দুর্গটার?' মনে করতে পারছে না মুসা।

'ব্ল্যাকস্টোন ক্যাসেল,' জিনা বলল। 'এই নিয়ে চারবার বললাম।'

'কি করব, মনে থাকে না। কোন সময় তৈরি হয়েছিল জানো নাকি কিছু?'

'সতেরোশো সালে। আব্বার কাছে শুনেছি এক সময় নাকি অনেক বড় দুর্গ ছিল ওটা। একবার মাত্র গেছি ওটার পাশ দিয়ে, তা-ও গাড়িতে করে, ভেতরে ঢুকিনি।'

'তারমানে অনেক পুরানো,' কিশোর বলল, 'দেখতে ভালই লাগবে মনে হচ্ছে।'

'ঐতিহাসিক দুর্গ নিশ্চয়?' জিজ্ঞেস করল বই পড়ুয়া রবিন। ইতিহাস ওর ভাল লাগে।

'তা তো থাকবেই,' জবাব দিল কিশোর। 'যে কোন পুরানো দুর্গেরই কিছু না কিছু ইতিহাস থাকে।'

কিছুক্ষণ পর দুর্গের সামনে এসে সাইকেল থেকে নামল গোয়েন্দারা। সাইকেল স্ট্যাণ্ডে রেখে টিকেট কেটে ভেতরে ঢুকল। ট্যুরিস্ট আসার মৌসুম এখন। বাইরে এসে থামল একটা বাস। সেটা থেকে নামল বেশ কিছু লোক। ওরাও ভেতরে ঢুকল। সবাইকে দুর্গ দেখাতে নিয়ে চলল একজন গাইড।

সবাই মন দিয়ে শুনছে ওর কথা, একজন বাদে, সে রাফিয়ান। দুর্গের ইতিহাসে কোন আগ্রহ নেই, তার কানে ঢুকেছে ইঁদুরের আকর্ষণীয় খুটুর-খাটুর। নাক কুঁচকে শুঁকে বোঝার চেষ্টা করছে কোনদিকে আছে

ওগুলো।

'সতেরোশো সালের মাঝামাঝি সময়ে শোফাইল ডোঁপা নামে এক ফরাসী জেনারেল তৈরি করেছিল এই দুর্গ,' গাইড বলল, 'কালো পাথর দিয়ে তৈরি বলে এর নাম রাখা হয়েছে ব্ল্যাকস্টোন ক্যাসেল। শোনা যায়, ডোঁপার কাছে নাকি অনেক ধনরত্ন ছিল। কোটি কোটি টাকা দাম হবে এখন সেগুলোর।'

অস্ফুট শব্দ করে উঠল পাশে দাঁড়ানো এক ইংরেজ মহিলা।

গাইড বলে যাচ্ছে দুর্গের ইতিহাস, 'তবে এই ধনরত্নের মালিক ডোঁপা ছিল না, ওগুলো দেখে রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল কেবল তাকে। আপনারা নিশ্চয় অর্ডার অভ দা টেম্পলারের নাম শুনেছেন? মধ্য যুগে গঠিত হয়েছিল এটা, তখনকার নাইটদের একটা ধর্মীয় সংগঠন। ওরা ছিল বড় বড় যোদ্ধা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন আর ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ থেকে এসে জোট বেঁধেছিল। ক্রুসেডে অংশ নিয়েছিল ওরা, তবে কোনও দেশের কোনও বিশেষ রাজার বশ্যতা স্বীকার করেনি। অনেক দেশেই তাদের হেডকোয়ার্টার ছিল।'

'ব্রিটেনের টেম্পল অভ লণ্ডনের নাম শুনেছ না?' বন্ধুদের বলল রবিন। 'টেম্পলাররাই ওই নাম রেখেছিল।'

'বাহ্, তুমি তো দেখি অনেক কিছু জানো,' প্রশংসা করল গাইড। 'প্রচুর বই পড়ো বোধহয়। ভাল। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ফ্রান্সের রাজা কিং ফিলিপ দ্য ফেয়ার এক সময় শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, তাঁর ধারণা হলো অতিরিক্ত শক্তিশালী হয়ে পড়েছে টেম্পলাররা, ওদের দমন করা দরকার। তাই তেরোশো সাত সালে ফ্রান্সে রাখা টেম্পলারদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। গ্রেপ্তার করালেন ওদের গ্র্যাণ্ড মাস্টারকে। টেম্পল অভ প্যারিসে ছিল ফ্রান্সের টেম্পলারদের হেডকোয়ার্টার। ওদের ধনরত্ন সব ওখানেই রাখা ছিল...'

শ্রোতাদের আগ্রহ বোঝার জন্যে কথা থামিয়ে ওদের মুখের দিকে তাকাল গাইড। সবাই তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। খুশি হয়ে বলতে লাগল আবার, 'রাজার পরিকল্পনা জেনে ফেলেছিলেন পোপ, শেষ মুহূর্তে সাবধান করতে পেরেছিলেন টেম্পলারদের। হাতে তখন সময় নেই। এর মধ্যেই যতটা পারল ধনরত্ন মাটিতে পুঁতে ফেলল, কিছু পাচার করে দিল বাইরে। শোফাইল ডোঁপার এক পূর্বপুরুষ ছিল টেম্পলার, কিছু জিনিস নিয়ে ফ্রান্স থেকে পালিয়ে এল সে। তারপর বংশ পরম্পরায় ওসব

জিনিস পাহারা দিতে লাগল ডোঁপারা—ওদের কাছে ওগুলো ছিল মহাপবিত্র, নষ্ট কিংবা খরচ করার কথা ভাবতেও পারত না; শেষ পাহারা দেয়ার ভার পড়েছিল শোফাইল ডোঁপার ওপর। শোনা যায়, এক সিন্দুক সোনার পাত, সোনা-রূপার অনেক গহনা, মুদ্রা আর দামী দামী পাথর ছিল তার কাছে। ডোঁপার মাথায় নাকি ছিট ছিল। বিয়ে-থা করেনি। সন্তান হয়নি। তার মৃত্যুর পর ওসব জিনিস পাহারা দেয়ার আর কেউ রইল না। কোথায় আছে ওগুলো বলেও যায়নি কাউকে। সুতরাং তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিখোঁজ হয়ে গেল অত টাকার ধনরত্ন।'

'গুপ্তধনগুলো এখন আছে কোথায়?' জিজ্ঞেস করল একজন আগ্রহী ট্যুরিস্ট। 'কেউ কিছু জানে?'

'না, জানে না,' গাইড বলল। 'বহু বছর আগের কথা। নিশ্চয় অনেক খোঁজা হয়েছে ওগুলো। কেউ পেয়ে গিয়ে থাকলে চুপচাপ মেরে দিয়েছে। কাউকে জানায়নি কিছু।'

যে লোকটা প্রশ্ন করল, সে লম্বা, চওড়া কাঁধ, ঝাঁকড়া চুল। তার একজন সঙ্গী আছে। ওই লোকটা বেঁটে, হালকা-পাতলা, চুল কম। সে বলল, 'গাধা হলে জানাত। জানালে অন্য কেউ কেড়ে নেয়ার ভয় আছে না।' খ্যাকখ্যাক করে হাসল সে।

তার কথা, হাসি কোনটাই ভাল লাগল না গাইডের। তবে কিছু বলল না। এড়িয়ে গেল।

ট্যুরিস্টদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দুর্গ দেখতে লাগল গোয়েন্দারা। গাইড ওদের নিয়ে যাচ্ছে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে। প্রায় সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত। দেখার তেমন কিছু নেই। একঘেয়ে লাগতে আরম্ভ করল মুসা আর জিনার। ঘর দেখার চেয়ে বরং লোক দু'জনের দিকে বেশি নজর দিল ওরা।

'বেঁটেটা তো একটা বানর,' ফিসফিস করে মুসা বলল, 'চেহারা দেখো! আর লম্বুটা হলো ষাঁড়!'

'কেমন অদ্ভুত জোড়, তাই না?' মুসার সঙ্গে একমত হয়ে বলল জিনা। 'তবে বেঁটেটাকে ভাঁড়ের মত লাগলেও লোক ভাল। দেখলে না, পকেট থেকে চিনির টুকরো বের করে দিল রাফিকে।'

রাফির সঙ্গে যে-ই ভাল ব্যবহার করবে, জিনার কাছে 'লোক ভাল' হয়ে যাবে সে। সুতরাং আলোচনাটা জমল না। কিশোরের হাত ধরে টানল মুসা, 'এই ভাঙাচোরা ইঁটের টুকরো আর কি দেখব। চলো, চলে

যাই।'

'দাঁড়াও না, আরেকটু দেখি। সুড়ঙ্গ আর মাটির নিচের ঘরগুলো তো একটাও দেখলাম না। ওগুলোই আসল।'

'ভূত নেই তো!'

হেসে বলল রবিন, 'থাকলেই বা কি? এত মানুষের মধ্যে ভূত বেরোনোর সাহস করবে না।'

একলা বেরিয়ে লাভে নেই. একা একা বিরক্ত লাগবে, তাই সবার সঙ্গে থাকতে বাধ্য হলো মুসা।

এই সময় গাইড বলল, 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টেলম্যান, দুর্গের ওপরটা দেখা শেষ করেছি আমরা, এবার নিচে নামব, মাটির নিচে। বিদ্যুৎ নেই এখানে, মোম নিয়ে নামতে হবে। একটু দাঁড়ান, সবাইকে এনে দিচ্ছি।'

মোম নিয়ে এসে সবার হাতে হাতে দিল সে। বলল, 'আসুন, এদিক দিয়ে আসুন।' এবং এই প্রথম যেন রাফিকে নজরে পড়ল তার। ভুরু কুঁচকে জিনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখো, কোন ধরনের পোষা জানোয়ার নিয়ে নামার নিয়ম নেই।'

'কি হবে?' তর্ক শুরু করল জিনা।

নিচে কুকুর নামলে কি অসুবিধে হবে, জবাব দিতে পারল না গাইড। শেষে আমতা আমতা করে বলল, 'ঠিক আছে, নামুক, তবে কোন গণ্ডগোল যেন না করে।'

হাঁপ ছাড়ল জিনা। তাড়াতাড়ি বলল, 'না না করবে না, রাফি খুব ভাল কুকুর। শক্ত করে ধরে রাখব আমি।'

'আর কোন প্রাণীতে অসুবিধে নেই তো?' মুচকি হেসে বলল বেঁটে লোকটা। পকেট থেকে একটা সাপ বের করে ফেলে দিল মাটিতে। 'এটা আমার পোষা সাপ, তবে বাঁধার উপায় নেই। কুকুরের মত গলাও নেই, কলার পরানোও যায় না। এখানেই থাক, কি বলেন?'

লাফিয়ে সরে গেল ইংরেজ মহিলা। আরও দু'জন মহিলা ভয়ে চিৎকার করে উঠল। হাতের ছড়ি তুলে বাড়ি মারতে এল একজন বয়স্ক লোক।

হেসে উঠল মুসা। 'দূর, এটা রবারের সাপ।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ট্যুরিস্টরা। কিন্তু গাইড রেগে গেল, 'এটা কি ধরনের রসিকতা হলো?' গোয়েন্দাদের দেখিয়ে বলল, 'ওরা করলেও নাহয় মানাত। আপনার বয়েসী একজন লোক…'

'সরি,' বলে সাপটা তুলে নিয়ে পকেটে ফেলল বেঁটে লোকটা।

ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল গাইড। বলল, 'আসুন আপনারা।' নিচে নামার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল সে।

কিশোরের কাছ ঘেঁষে এল মুসা। 'কেমন অদ্ভুত আচরণ করল লোকটা, তাই না?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

দুই

গাইডের পিছু পিছু খুব সাবধানে নামতে লাগল দলটা। ক্ষয়ে যাওয়া সিঁড়ি, অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে। পা পিছলালে ঘাড় ভেঙে না মরলেও হাত-পা ভাঙতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ছোট একটা ঘরে নামল গাইড। ঘরটার নিচু ছাত, শান বাঁধানো মেঝে, দেয়ালগুলো চারকোণা নয়, গোল। সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে সবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

সবাই নেমে এসে ঘিরে দাঁড়াল ওকে। মোমটা উঁচু করে ধরে বলল সে, 'সুড়ঙ্গ ধরে গিয়ে এবার ডানজনগুলো দেখব আমরা। তবে বেশির ভাগ ঘরেই ঢোকা যাবে না। ইঁট গেঁথে দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, যাতে কেউ ঢুকতে না পারে।'

'ও, তাহলে আর কি দেখব!' হতাশ হয়ে বলল জিনা। মাটির নিচের ওসব ঘর দেখার আগ্রহই বেশি ছিল তার।

'এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না,' সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল গাইড। 'খোলা রাখলে কখন কার মাথার ওপর ভেঙে পড়ে ঠিক আছে নাকি। ওই একটা বাদে,' হাত তুলে একটা সুড়ঙ্গমুখ দেখাল সে, 'আর সব বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ওটাও দেয়া হবে শীঘ্রি। এখানে কোন দুর্ঘটনা ঘটুক, এটা চাই না আমরা।'

সুড়ঙ্গমুখটা দিয়ে মাঝারি উচ্চতার একজন মানুষ সোজা হয়ে হেঁটে ঢুকতে পারবে। ভেতরে কি আছে ভাল করে দেখার জন্যে মোম হাতে মুখটার কাছে এগিয়ে গেল সবাই। উঁকি দিতে লাগল ভেতরে। পারলে ঢুকে পড়ে।

গাইড বলল, 'দেখুন, ঢোকাটা মোটেও নিরাপদ নয়, তাহলে বাধা দিতাম না। অনেক জায়গায় দেয়াল ভেঙে পড়েছে, ছাতও পড়ে যেতে পারে যে কোন সময়। ট্যুরিস্টদের ঢুকতে বারণ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।'

জিনার মতই তিন গোয়েন্দাও হতাশ হলো। সবই যদি বন্ধ তাহলে আর কি দেখতে এল।

ওদের মুখ কালো হয়ে যেতে সান্ত্বনা দেয়ার সুরে গাইড বলল, 'মন খারাপ কোরো না। ওসব ঘরে দেখার তেমন কিছু নেই। রহস্যময় কিছু নেই এ দুর্গের নিচে।'

'কেন, গুপ্তধন আছে বলালেন না?' রসিকতা করে বলল বেঁটে লোকটা।

'আছে বলিনি, বলেছি ছিল। দেয়াল তুলে দরজা বন্ধ করার আগে প্রতিটি ঘর তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। কিছুই পাওয়া যায়নি, একটা মোহরও না। তো, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টেলম্যান, ওপরে যেতে পারি আমরা, কি বলেন?'

কেউ বলল, চলুন। কেউ বলল, কিছুই তো দেখলাম না।

গাইড মাথা নাড়ল, 'এর বেশি আর কিছু দেখার উপায় নেই, সরি।' মোম হাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল সে। এই সময় এক কাণ্ড করল রাফি। একটা ইঁদুর দেখে 'ঘাউ' করে উঠে এক হ্যাঁচকা টানে জিনার হাত থেকে কলার ছুটিয়ে নিয়ে পিছু নিল ওটার।

চিৎকার করে ডাকতে লাগল জিনা, 'এই, রাফি, জলদি আয়! ভাল হবে না বলছি! আয়!'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। ইঁদুরের পিছু নিয়ে ঘাউ ঘাউ করতে করতে অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল সে।

আবার চিৎকার করল জিনা, 'এলি না! রাফি!' ধরে আনার জন্যে সে-ও পিছু নিল কুকুরটার।

সুড়ঙ্গের ভেতরে আশা করেছিল পাথর, ইঁট-কাঠের ছড়াছড়ি হবে, কিন্তু ওসব কিছুই নেই। পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। অনেক সামনে চলে গেছে রাফি, ওর ডাক কানে আসছে। মোমটা মাথার ওপর উঁচু করে ধরে দ্রুত এগোল জিনা।

ট্যুরিস্টরা সবাই উঠে গেছে সিঁড়িতে, কেবল দাঁড়িয়ে আছে উদ্বিগ্ন তিন গোয়েন্দা। সুড়ঙ্গের দিকে তাকিয়ে জিনার ফেরার অপেক্ষা করছে ওরা। গাইড বলেছে সুড়ঙ্গটায় ঢোকা বিপজ্জনক, ধসে পড়ার ভয় আছে।

জিনা বিপদে পড়বে না তো?

অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠল কিশোর। মুসা আর রবিনকে নিয়ে ঢোকার কথা ভাবছে, এমন সময় রাফিকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে এল জিনা। ওপরে ওঠার পর তাকে খুব একচোট বকে নিল গাইড। বলল, 'কুকুর নিয়ে কেন ঢোকা বারণ, বুঝলে তো এবার?'

জবাব দিতে পারল না জিনা।

স্ট্যাণ্ড থেকে সাইকেল নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা। মুখ বাঁকিয়ে মুসা বলল, 'ঘোড়ার ডিমের দুর্গ! ও একটা দেখার জিনিস হলো নাকি!'

বাড়ি ফিরে যখন দেখল, টেবিলে চা-নাস্তা সাজিয়ে অপেক্ষা করছেন জিনার আম্মা মিসেস পারকার, তিন গোয়েন্দার কেরিআন্টি, হাসি ফুটল মুসার মুখে। স্যাণ্ডউইচ, ফ্রুট কেক, মাখন, আপেলের জ্যাম দেখে চেহারার ভঙ্গিই বদলে গেল ওর। ভুলে গেল বিরক্তিকর ব্ল্যাকস্টোন ক্যাসেলের কথা। চেয়ার টেনে বসে পড়ল। খিদে পেয়েছে, তাই খাবার দেখে সবার মুখই উজ্জ্বল, কেবল জিনা চুপ করে রইল। মনে হচ্ছে খুব চিন্তিত।

ব্যাপারটা লক্ষ করে উদ্বিগ্ন হলেন মিসেস পারকার, 'জিনা, কি হলো তোর? বেশি রোদ লাগিয়েছিস নাকি? জ্বর-টর এল না তো?'

'না, মা, আমি ঠিকই আছি।'

বাগানে কাজ করতে হবে। উঠে চলে গেলেন মিসেস পারকার।

চা খাওয়া হয়ে গেলে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, জিনা? কিছু একটা হয়েছে তোমার, কোন সন্দেহ নেই। কি ভাবছ?'

'বুঝতে পারছি না!'

'কি বুঝতে পারছ না?'

'সুড়ঙ্গের মধ্যে মনে হলো কিছু একটা দেখেছি!'

চমকে গেল মুসা, 'খাইছে! ভূত না তো? তোমাকে ধরতে আসছিল?'

'আরে দূর, তোমার খালি ভূত-ভূত,' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রবিন। 'জিনা, কি দেখলে?'

জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল জিনা, মা আসছে কিনা। বলল, 'রাফির পিছু পিছু সুড়ঙ্গে ঢুকে গেলাম। মোমবাতিটা তুলে ধরে রেখেছি। সামনে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঘেউ ঘেউ করছে রাফি। ইঁদুরটা

বোধহয় ওখানেই ঢুকেছিল। একটা গর্তের মধ্যে পেলাম ওকে। ঝুঁকে ওর কলার চেপে ধরে আবার সোজা হয়ে তাকাতেই চোখ পড়ল দেয়ালে। অদ্ভুত কিছু চিহ্ন খোদাই করা দেখলাম ওখানে।'

'কি ধরনের চিহ্ন?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকে গেল কিশোর।

'অনেকটা হাইআরোগ্লিফের মত, পুরানো আমলের কোন লেখা। রহস্যময়, কোন সন্দেহ নেই। ভাল করে দেখার সুযোগ পাইনি। তা ছাড়া অনেক জায়গায় ক্ষয়ে গেছে। কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে মাথার মধ্যে গেড়ে বসেছে জিনিসটা। আমার কি মনে হয় জানো, ওটা কোন ধরনের মেসেজ, গুপ্তধন কোথায় আছে সেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে লেখাগুলোতে। টেম্পলারদের গুপ্তধন।'

হেসে উঠল মুসা, 'পাগল আরকি। একবার ঢুকে এত সহজেই যেটা তোমার চোখে পড়ে গেল সেটা ভেবেছ আর কারও চোখে পড়েনি?'

'না, পড়েনি!' জোর দিয়ে বলল জিনা। 'শোফাইল ডোপা বেঁচে থাকতে অন্য কারও ঢোকার সম্ভাবনা ছিল না ওখানে।'

মুসার পক্ষ হয়ে তর্ক শুরু করল রবিন, 'কিন্তু তার মৃত্যুর পর? শত শত বছর ধরে হাজার হাজার মানুষ ঢুকেছে ওখানে। কেউই দেখেনি, এটা বিশ্বাস করতে বোলো না আমাকে।'

মুখ কালো করে ফেলল জিনা, সমর্থনের আশায় কিশোরের দিকে তাকাল, 'কিশোর, তুমি কি বলো?'

চুপ করে ভাবছিল কিশোর, বলল, 'উঁ! আমি? আমার ধারণা, সাংকেতিক ওই লেখা গুপ্তধনেরই মেসেজ। নইলে কথা নেই বার্তা নেই দেয়ালের গায়ে কতগুলো চিহ্ন আঁকতে যাবে কেন কেউ? এখন প্রশ্ন হলো, গুপ্তধনগুলো উদ্ধার হয়েছে কিনা? হতেও পারে, আবার নাও পারে। লোকের চোখে পড়লে আর চেষ্টা করলেই যে মানে বের করে ফেলতে পারবে, এর কোন শিওরিটি নেই। তা ছাড়া পাওয়া গিয়ে থাকলে গুজব শোনা যেত, কিন্তু ওরকম কোন গুজব আজও শোনা যায়নি।'

'তবে আমি নিরানব্বই ভাগ শিওর,' মুসা বলল, 'গুপ্তধন নেই।'

'তাহলেও এক পার্সেন্ট সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।'

কিশোর পক্ষ নেয়ায় গলার জোর বাড়ল জিনার, 'বসে বসে খামাকা তর্ক আর বকর বকর না করে গিয়ে দেখলেই তো পারি? অত ধরে নেয়ানেয়ির দরকারটা কি? আর ধরছিই যখন, নেই না বলে আছে বলতে

বাধা কোথায়? আছে বললে আর কিছু না হোক, ছুটি কাটানোর জন্যে একটা মজার কাজ তো পেয়ে যাব।'

'এটা অবশ্য যুক্তির কথা,' রবিন বলল। 'ঠিক আছে, গুপ্তধন খোঁজার সপক্ষে প্রথম ভোটটা আমিই দিলাম।'

'আমিও,' হাত তুলল কিশোর।

'চারজনের মধ্যে তিনজন তো হয়েই গেলে,' মুখ গোমড়া করে বলল মুসা, 'আমি আর বাদ থাকি কেন? দুর্গের তলায় গুপ্তধন খুঁজতে যেতে আমার কোন আপত্তি অবশ্য থাকত না...'

'যদি না ভূতের ভয় থাকত,' ফোড়ন কাটল রবিন। 'গুপ্তধনের সঙ্গে সঙ্গে এবার নাহয় ভূতও শিকার করব আমরা, কি বলো, কিশোর?'

'অত বড় বড় কথা বোলো না!' রেগে গেল মুসা, 'যেদিন পড়বে ওদের খপ্পরে, সেদিন বুঝবে মজা!'

'তাহলে গুপ্তধন উদ্ধারে যাচ্ছি আমরা,' আগের কথায় ফিরে এল জিনা, 'কিশোর, কোনখান থেকে শুরু করা যায় বলো তো? এক কাজ করা যাক, সুড়ঙ্গে ঢুকে আগে লেখাগুলো নকল করে আনা যাক। তারপর মানে বের করার চেষ্টা করব।'

'কিন্তু ঢুকব কি করে?' কিশোর বলল। 'দিনের বেলায় তো অসম্ভব। দুর্গ লোকজন, ট্যুরিস্টে ভরা থাকে।'

'ক্যাসেল দেখার ছুতোয় সবার সঙ্গে নিচে নামব আমরা,' রবিন পরামর্শ দিল ঃ 'এক ফাঁকে ওদের অলক্ষে সরে যাব।'

'পাঁচজন একসঙ্গে সরব? অসম্ভব! দেখে ফেলবে।'

অনেকক্ষণ চুপ থেকে থেকে বোধহয় বিরক্ত হয়ে পড়ল রাফি। ওর দিকে কেউ তাকাচ্ছেও না। সে যে আছে ওখানে জানান দেয়ার জন্যে নাক তুলে বলল, 'হুউ!'

হেসে ফেলল মুসা, 'দূর ব্যাটা, চুপ কর! পণ্ডিত হয়েছে!'

কি বুঝল কুকুরটা কে জানে, মুসার দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে জিভ ঝুলিয়ে দিল। ওর প্রতি যে নজর দেয়া হয়েছে এতেই খুশি ও।

'তাহলে কি ভাবে ঢুকতে চাও?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'রাতের বেলা। দুর্গে চুরি করার কিছু নেই, তাই ওই সময় পাহারা থাকে না। সহজেই ঢুকে পড়তে পারব আমরা।'

আঁতকে উঠল মুসা, 'রাতের বেলা অন্ধকারের মধ্যে!'

'মাটির নিচে দিনই কি আর রাতই কি? সব সময় অন্ধকার। বাইরে

অবশ্য অন্ধকার থাকবে না, পূর্ণিমা।'

'তবু...'

হেসে বলল রবিন, 'পূর্ণিমার সময়ও রাতের বেলা তেনারা বেরোন কিনা, তাই ওনার এত ভয়।'

'ভূত!' বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর, 'এক কথার মধ্যে আরেক কথা! এই ভূতের ফ্যাঁচফ্যাচানি বাদ দাও তো!...রাতের বেলাই সুড়ঙ্গে ঢুকব আমরা, এবং আজ রাতেই, আর কোন উপায় নেই। ঠিক আছে?'

সন্ধ্যা লাগতেই সাদা থালার মত বিশাল এক চাঁদ উঠল। আবহাওয়া ভাল। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর জিনার বাবা-মা বেডরুমে ঢুকে গেলে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ল গোয়েন্দারা। সঙ্গে নিল টর্চ, কাগজ আর পেন্সিল। সাইকেল নিয়ে ব্ল্যাকস্টোন ক্যাসলে রওনা হলো।

তাড়া নেই, ধীরেসুস্থে সাইকেল চালাচ্ছে ওরা। মুসার পাশে পাশে দৌড়াচ্ছে রাফি। সাগর থেকে ফুরফুরে হাওয়া আসছে।

অবশেষে সামনে দেখা গেল বিশাল ক্যাসলের কালো অবয়ব।

দুর্গের কাছে এসে সাইকেল থেকে নামল গোয়েন্দারা। আশপাশটা নির্জন। কোন লোক চোখে পড়ল না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কিশোর বলল, 'যা বলেছিলাম, পাহারা নেই।'

একদিকে দেয়ালের কাছে কিছু ইঁট-বালি আর সুরকি পড়ে আছে। দেয়ালে মস্ত এক ফোকর। অনেকখানি ধসে পড়েছে। সেটা মেরামত করার জন্যেই বোধহয় আনা হয়েছে ওগুলো।

মুসা বলল, 'এখান দিয়েই তো ঢোকা যায়।'

তা যায়। ঢুকতে কষ্ট হলো না মোটেও। দিনের বেলা ভালমত দেখে গেছে, সুতরাং সুড়ঙ্গে ঢোকার পথটাও খুঁজে বের করে ফেলল সহজেই। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল ওরা। আগে আগে চলেছে জিনা। রাফির কলার শক্ত করে ধরে রেখেছে। ইঁদুরের গন্ধ পেয়ে কেবলই ছুটে যেতে চাইছে রাফি।

পথ দেখিয়ে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে চলল জিনা। পায়ের শব্দ বদ্ধ জায়গায় প্রতিধ্বনিত হয়ে বিচিত্র আওয়াজ তুলছে। গায়ে কাঁটা দিল মুসার। ভয়ে ভয়ে তাকাল চারপাশে।

একটা দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল জিনা। আলো ফেলল দেয়ালে। বলল, 'এই যে, দেখো।'

গলা বাড়িয়ে দিল তিন গোয়েন্দা। দেখল, তিন লাইনে আঁকা

হয়েছে অদ্ভুত শব্দগুলো, এ ভাবে:

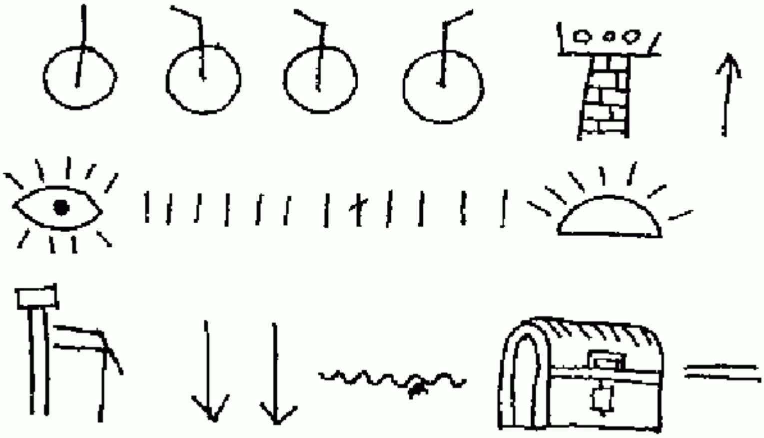

'হুঁম!' মাথা দুলিয়ে বলল কিশোর, 'রহস্যময়ই মনে হচ্ছে। রবিন, লিখে ফেলো।'

কাগজ-পেন্সিল বের করে নকল করতে আরম্ভ করল রবিন। বাকি তিনজনে টর্চের আলো ফেলে আশপাশটা দেখতে লাগল।

'বেশি ক্ষয় হয়ে গেছে,' রবিন বলল। 'অনেক জায়গা পড়া যায় না।'

'তারমানেই অনেক পুরানো,' কিশোর বলল।

'সুতরাং এটা টেম্পলারদের গুপ্তধনের মেসেজ, ভাবতে অসুবিধে নেই,' বলল জিনা।

'যদি নাও হয়,' মুসা বলল, 'খেলা হিসেবেই নেব এটাকে আমরা। রাত দুপুরে এসে সুড়ঙ্গে নামাটাও কম রোমাঞ্চকর নয়।'

দ্রুত কাজ সেরে ফেলল রবিন। নকলটা ঠিকমত হয়েছে কিনা, দেয়ালের লেখার সঙ্গে বার বার মিলিয়ে দেখল। সন্তুষ্ট হয়ে কাগজটা ভাঁজ করে রেখে দিল পকেটে। মুখ তুলে বলল, 'শেষ।'

কিশোর বলল, 'চলো তাহলে। এখানে আর কিছু করার নেই।'

ফিরে চলল গোয়েন্দারা। এত তাড়াতাড়ি ফেরার ইচ্ছে নেই রাফির। মাত্র তো ঢুকল, একটা ইঁদুরকেও তাড়া করা হলো না। জিনার

দিকে তাকিয়ে আবদার করল, 'খোক!'

'ইঁদুর তাড়ানো লাগবে না,' সাফ মানা করে দিল জিনা। 'গিয়ে পড়ো কোন চোরা গর্তের মধ্যে। তারপর তোমাকে বের করতে গিয়ে মরি আমরা। ওসব হবেটবে না।'

তিন

পরদিন সকালে কাগজটা নিয়ে বসল ওরা। কোন মানে বের করতে পারল না। অনেক মাথা খাটিয়েও কিছু বের করতে পারল না কিশোর। শেষে বলল, 'এটা আপাতত থাক। পরে হয়তো বুঝতে পারব। আগে ব্ল্যাকস্টোন ক্যাসেল সম্পর্কে আরও জানা দরকার।'

এবং সেটা জানার জন্যেই দল বেঁধে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

মুসার মনে হচ্ছে, অহেতুক সময় নষ্ট করতে যাচ্ছে ওরা, তার চেয়ে সাগরে সাঁতার কাটতে নামলে অনেক ভাল হত। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যেন খুঁজতে হবে বললে কিশোর, আর্ক?'

হেসে ফেলল রবিন, 'আরে না, আর্ক মানে তো নৌকা। আমরা যাচ্ছি আর্কাইভে।'

কিন্তু টাউন হলে পৌঁছে হতাশ হতে হলো ওদের। ব্ল্যাকস্টোন ক্যাসেলের ব্যাপারে তথ্য জোগাড় করতে এসেছে শুনে রিসেপশনিস্ট বলল, এখানে কিছু নেই। তবে ওদের সাহায্য করল সে। আরেকটা অফিসে ফোন করে সেখানকার ক্লার্ককে বলে দিল ওদের সাহায্য করার জন্যে। ক্লার্ক একজন বুড়ো মানুষ, অনেক বড় গোঁফ, রিসেপশনিস্টের মতই ভদ্র, আন্তরিকতার অভাব নেই। কিন্তু গোয়েন্দাদের তেমন কোন সাহায্য করতে পারল না।

'আমাদের আর্কাইভ থাকলে অবশ্যই দেখাতাম তোমাদের,' বলল সে। 'কিন্তু জন্ম-মৃত্যু আর বিয়ে সংক্রান্ত রেকর্ড ছাড়া আর কিছুই নেই আমাদের রেজিস্টারে। ব্ল্যাকস্টোন বা এই এলাকার অন্য কোন ক্যাসেলের কথা নেই। এলাকার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছ তোমরা, খুব ভাল কাজ, সাধ্য থাকলে সব রকম সাহায্য করতাম তোমাদের। এক

কাজ করো না বরং, মিউজিয়ামে চলে যাও, ওখানে কিছু পেতে পারো।'

ক্লার্ককে ধন্যবাদ জানিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল ওরা। আরও হতাশ হয়েছে। মুসা তো বলেই বসল, 'জাহান্নামে যাক গুপ্তধন! চলো, সাঁতার কাটিগে। বৃষ্টি নামলে আর কিছু করতে না পারলে তখন আবার নাহয় খুঁজতে বেরোব।'

জেদ চেপে গেছে কিশোরের। মাথা নেড়ে বলল, 'না, এর একটা কিনারা না করে আর কিছু করা নেই। মিউজিয়ামে যাব আমরা।'

আর আপত্তি করে লাভ নেই বুঝে চুপ হয়ে গেল মুসা।

মিউজিয়ামে এল ওরা। ছোট মিউজিয়াম। ডেস্কে বসে আছে এক মহিলা। হাসি দিয়ে স্বাগত জানাল ওদের। একা বসে থাকতে থাকতে বোধহয় বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল, ওদের প্রশ্নের জবাব দিতে কোন দ্বিধা করল না।

'হ্যাঁ, ব্ল্যাকস্টোন ক্যাসেলের ব্যাপারে কিছু তথ্য আছে আমাদের রেকর্ডে। এমনকি একটা নকশাও প্রিন্ট করে বিক্রি করি আমরা, যাতে দুর্গের মধ্যে ঘুরতে সুবিধে হয় ট্যুরিস্টদের,' মহিলা জানাল।

এটা একটা খবর বটে। মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল গোয়েন্দাদের মুখ। ওরা ভেবেছিল, এখানেও নিরাশ হতে হবে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে পয়সা বের করে দিল কিশোর, 'একটা কপি দিন আমাকে।'

ড্রয়ার থেকে এক কপি নকশা বের করে দিয়ে মহিলা বলল, 'অবাক কাণ্ড! তিন-চার হপ্তা ধরে একটা নকশাও বেচতে পারলাম না, আর আজ সকাল বেলাতেই দুই-দুইটা! একটু আগে দু'জন ভদ্রলোক এসে এক কপি কিনে নিয়ে গেছে। আজব জোড়! একজন লম্বা, আরেকজন বেঁটে; একজন ষাঁড়ের মত, আরেকজন যেন ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে। বেঁটে লোকটা আচরণও করে কেমন ভাঁড়ের মত!'

চট করে কিশোরের দিকে তাকাল জিনা। মহিলার বর্ণনা শুনেই আঁচ করে ফেলেছে লোকগুলো কে। গতকাল দুর্গ দেখতে গিয়েছিল ওরাও। নকশায় আগ্রহী কেন? ওরাও কি গুপ্তধন খুঁজছে?

'নকশার কপি কিনেছে, না?' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বলল, 'এসো, মিউজিয়াম দেখি।'

ওরা ছাড়া আর কোন দর্শক নেই। দেখারও নেই তেমন কিছু। নকশাটাও ওদের কোন তথ্য দিতে পারল না। বরং হতাশ করল আরও।

কিশোর খুশি হয়েছিল ভেবে, মাটির নিচের ঘর আর সুড়ঙ্গগুলো আঁকা থাকবে, কিন্তু নেই। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বলে ওগুলো আঁকার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি নকশাকার। ট্যুরিস্টই যদি ঢুকতে না পারে এঁকে লাভ কি!

মহাবিরক্ত হয়ে মুসা বলল, 'এ সব বাদসাদ দিয়ে চলো কাজের কাজ করিগে কিছু। গুপ্তধন পাওয়া যাবে না।'

'যাবে না ধরে নিয়েই কাজে নেমেছি আমরা,' দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল কিশোর। 'মন খারাপ করছ কেন?'

'একটা জায়গা খোঁজা বাকি রয়ে গেছে এখনও,' জিনা বলল, 'পাবলিক লাইব্রেরি।'

ওদের কথা শুনে ফেলল ডেস্কে বসা মহিলা। হেসে বলল, 'যাও, ওখানে গেলে ওই দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। ওরাও বলাবলি করছিল, ওখানে যাবে। ইদানীং দেখি আমাদের লোকাল হিস্টরিতে আগ্রহী হতে আরম্ভ করেছে লোকে। ভাল।'

বাইরে চলে এল ওরা। উজ্জ্বল রোদে দাঁড়িয়ে লাইব্রেরিতে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করল কয়েক মিনিট।

'আমরা যা করছি, ঠিক তাই করছে ওই দু'জনও,' জিনা বলল, 'এটা তোমাদের অবাক করছে না? মিস্টার লম্বু আর মিস্টার বাঁটুল—নামটা কেমন হলো?—যাই হোক, ওরা যা করছে, রীতিমত সন্দেহ জাগায়।'

'আমার জাগায় না,' মুসা বলল। 'ওরা ট্যুরিস্ট। ট্যুরিস্টরা যা করে থাকে, ঠিক তাই করছে, এতে অবাক হওয়ার কি দেখলে?'

রেগে উঠল জিনা, 'আসলে জেদ করছ তুমি। যেহেতু তোমার পছন্দ হচ্ছে না কাজটা, তাই উল্টো তর্ক করছ।'

ঝগড়া বেধে যায় দেখে তাড়াতাড়ি বলল রবিন, 'দু'জনের কথাই ঠিক হতে পারে। গুপ্তধন খোঁজায়ও লাগতে পারে ওরা, আবার ট্যুরিস্টের সাধারণ কৌতূহলও হতে পারে।'

'কোনটা ঠিক?' মুসার প্রশ্ন।

'সেটা জানার জন্যেই লাইব্রেরিতে যেতে হবে আমাদের,' সমাধান দিয়ে দিল কিশোর। 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখানে ঝগড়া করে আর অনুমানের ওপর কথা বলে লাভ নেই। চলো।'

মিউজিয়াম থেকে বেশি দূরে না লাইব্রেরি। ওরাও ঢুকছে, ওই দুই ট্যুরিস্টও বেরিয়ে আসছে। আরেকটু হলেই লম্বুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে যেত

জিনার।

ওরাও চিনে ফেলল ছেলেমেয়েদেরকে।

চওড়া হাসি হেসে বলল বেঁটে লোকটা, 'হাল্লো, আছ কেমন? তোমার কুকুরটা এখনও ভালই আছে দেখছি। ওর তো এতদিনে পেটে অসুখ হয়ে মরে যাওয়ার কথা, যা পেটুক। বাইরের কেউ কিছু দিলে খাওয়া উচিত নয়। কাল আমি চিনির টুকরো দিলাম, আর কেমন গপগপ করে খেয়ে ফেলল,' রাফির মাথায় চাপড় মেরে আদর করল সে। 'তবে লোভী হলেও অন্যান্য স্বভাব ভাল।'

রাফিও লেজ তুলে নাড়তে লাগল। তাকিয়ে রইল লোকটার হাতের দিকে, পকেটে ঢোকে কিনা দেখছে।

কিন্তু নিরাশ হতে হলো ওকে। আজ আর চিনির টুকরো পাওয়া গেল না।

'নাম কি কুকুরটার?' লম্বা লোকটা জিজ্ঞেস করল।

'রাফিয়ান,' জবাব দিল জিনা। 'আমরা ডাকি রাফি।'

'সুন্দর নাম। যাই, কাজ আছে। কই, এসো।'

গেটের দিকে চলে গেল দু'জনে।

লাইব্রেরিতে ঢুকল গোয়েন্দারা।

বইয়ে সিল মারছে একজন কর্মচারী। তাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে দেখা করা যাবে কিনা। যাবে, বলে অফিস দেখিয়ে দিল লোকটা।

লাইব্রেরিয়ানের নাম মিস্টার হেমিঙ। মাঝবয়েসী, হাসিখুশি একজন ভদ্রলোক। ছেলেমেয়েদের স্বাগত জানালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি জানতে চাও?'

তিন গোয়েন্দা, বিশেষ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল জিনা, গুপ্তধনের কথা বলে দেয়া উচিত হবে কিনা। ইশারা করল কিশোর। আর দ্বিধা রইল না জিনার। ওদের আসার উদ্দেশ্য জানাল লাইব্রেরিয়ানকে।

শুনে হাসলেন মিস্টার হেমিঙ। 'হুঁ, দেয়ালের লিখন তাহলে তোমাদেরও আগ্রহী করেছে। অনেকেই দেখেছে ওই লেখা, তোমাদের মতই ভেবেছে টেম্পলারদের গুপ্তধনের নিশানা রয়েছে ওই চিহ্নগুলোতে। তোমরা ভাবছ গুপ্তধনগুলো লুকানো আছে এখনও?'

'থাকতে পারে, তাই না?' ঘুরিয়ে বলল কিশোর। 'এমন কিছু তথ্য

খুঁজছি যার সাহায্যে মেসেজের মানে বের করতে পারি। রবিন, দাও তো কাগজটা।' রবিন কাগজ বের করে দিলে সেটার ভাঁজ খুলে মিস্টার হেমিঙের সামনে রাখতে রাখতে বলল সে, 'কপি করে এনেছি আমরা। আপনি কি কোন সাহায্য করতে পারেন আমাদের?'

'এগুলোর কয়েকটা চিহ্নের মানে অবশ্য বোঝা যায়,' মিস্টার হেমিঙ বললেন। 'হাইআরোগ্লিফ জানি না আমি। এগুলো হাইআরোগ্লিফ কিনা, তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

'তারমানে আগেও দেখেছেন এই চিহ্ন!'

মাথা ঝাঁকালেন হেমিঙ। 'অনেকেই দেখেছে। তোমাদের মত কপি করেও এনেছে।'

হতাশা ঢেকে রাখতে পারল না গোয়েন্দারা।

'ও,' ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'যে ক'টার মানে বুঝেছেন, ওগুলো বলতে অসুবিধে আছে?'

'অসুবিধে নেই, তবে এ দিয়ে তো এগোতে পারবে না। প্রথম কয়েকটা চিহ্নের মানে জেনেছে অনেকেই, কিছু করতে পারেনি। সবগুলোর মানে বের করতে না পারলে লাভ নেই। কেউ পেরেছে কিনা, তাও বলতে পারব না।'

'যেটুকু জানেন, সেটুকুই বলুন না, প্লীজ!'

কাগজটা টেনে নিলেন হেমিঙ। টেবিলের চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল গোয়েন্দারা। ছবিগুলোর দিকে তাকাল।

'এই যে দেখো, এই গোল চিহ্নটা,' প্রথম সারির প্রথম চিহ্নটার ওপর আঙুল রাখলেন হেমিঙ, 'এটা দিয়ে সুড়ঙ্গমুখ বোঝানো হয়েছে, যেটা দিয়ে ঢুকে মেসেজটা দেখেছ তোমরা। গোলের ভেতরের এই লম্বা দাগটা দিয়ে হয়তো বোঝানো হয়েছে সুড়ঙ্গ ধরে সোজা চলে যাও।'

নিজের অজান্তে মৃদু শিস দিয়ে উঠল মুসা। আগ্রহী হতে আরম্ভ করেছে। বিরক্তি চলে গেছে চেহারা থেকে। সাঁতারের কথা ভুলে গেছে। আরও সামনে ঝুঁকে পড়ল সে।

দ্বিতীয় চিহ্নটা দেখিয়ে হেমিঙ বললেন, 'দেখো, একই রকম গোল চিহ্নের ভেতর দিয়ে আরেকটা রেখা বেঁকে গেছে বাঁ দিকে...'

'তারমানে সুড়ঙ্গের মধ্যে বাঁয়ে মোড় নিতে বলা হচ্ছে!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে রবিন।

'হ্যাঁ। আর এই তৃতীয়টা…'

'আবার বাঁয়ে মোড়!' বলে উঠল উত্তেজিত জিনা।

'এবং চার নম্বরটা ডানে মোড়,' শান্তকণ্ঠে কিশোর বলল।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন হেমিঙ। 'আর এই পাঁচ নম্বর ছবিটা দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে, বলতে পারবে না?' সবার মুখের দিকে তাকালেন তিনি। 'কিসের মত লাগছে দেখতে?'

'টাওয়ার!' বলে ফেলল কিশোর।

'ঠিক। প্রথম থেকে চিহ্নগুলো দিয়ে বোঝানো হয়েছে সুড়ঙ্গ ধরে ডানে-বাঁয়ে মোড় নিতে নিতে একটা টাওয়ারের নিচে পৌঁছবে তুমি। ছয় নম্বরে তীর চিহ্ন আঁকা হয়েছে ওপর দিকে করে…'

'তারমানে ওপরে ওঠার নির্দেশ দিচ্ছে,' শেষ করে দিল কিশোর।

'হ্যাঁ, বুঝে গেছ, চালাক ছেলে,' হেমিঙ বললেন। 'তবে এ পর্যন্ত অনেকেই বুঝেছে। তার পরের দুটো লাইন বুঝতে পারেনি। এই চোখের মত চিহ্নটা কি, তারপরের খাড়া খাড়া দাগগুলো, আধখানা সূর্য, নিচের এ সব বিচিত্র চিহ্ন, এ সবের মানে কেউ বুঝতে পেরেছে বলে জানা যায়নি।'

'তারমানে আশা এখনও আছে আমাদের,' জ্বলজ্বল করছে জিনার মুখ।

হাসলেন হেমিঙ, সরাসরি 'না' বলে দিয়ে আশাহত করতে চাইলেন না মেয়েটাকে। বললেন, 'গুপ্তধন খোঁজা যদি চালিয়েই যেতে চাও, অহেতুক সুড়ঙ্গে নেমে কষ্ট করবে কেন? ছাত ধসে তলায় পড়ে মরার ঝুঁকিও আছে। তা ছাড়া দুর্গের নিচে গুপ্তধন আছে এমন কোন ইঙ্গিত দেয়া হয়নি, বরং টাওয়ার দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। ব্ল্যাকস্টোন ক্যাসেলের কাছে একটা টাওয়ার আছে, ওটায় গিয়ে দেখতে পারো। ধসে পড়তে দেয়া হয়নি টাওয়ারটা, মেরামত করে এখনও খাড়া রাখা হয়েছে, তবে ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া আর কিছু নেই তাতে। অতি সাধারণ। রহস্যময় কিছুও নেই। স্থানীয় লোকেরা নাম দিয়েছে ওয়াচ টাওয়ার। কোন জায়গায় আছে ওটা, চাও যদি সার্ভে ম্যাপে দেখিয়ে দিতে পারি।'

'দেখাতে হবে না, চিনি,' জিনা বলল। নিরাশ হয়েছে। 'আপনি বলতে চাইছেন ওখানেও গুপ্তধন নেই?'

শব্দ করে হাসলেন হেমিঙ। 'নেই, তা তো বলিনি। বলেছি টাওয়ারটার কোন রহস্য নেই।'

লাইব্রেরিয়ানের কাছে অনেক সাহায্য পাওয়া গেছে। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরোতে যাবে এই সময় কথাটা মনে পড়ল কিশোরের। জিজ্ঞেস করল, গুপ্তধনের খোঁজ নিতে দু'একদিনের মধ্যে আর কেউ এসেছিল কিনা। হেমিঙ বললেন, আসেনি। কিন্তু তাঁর সহকারী বলল এসেছিল। দু'জন লোক, একজন লম্বা, আরেকজন বেঁটে। ব্ল্যাকস্টোন ক্যাসেলের ওপর লেখা কোন বই আছে কিনা, তাও জানতে চেয়েছিল।

'লম্বু এবং বাঁটুল!' ফোঁস করে উঠল জিনা। 'তারমানে ওরাও লেগেছে এর পিছে! আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী।'

'নাও হতে পারে,' কিশোর বলল। 'আর যদি হয়ও অসুবিধে কি? এটা একটা খেলা, প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলে জমবে।'

'ওদের থেকে এক পয়েন্ট এগিয়ে আছি আমরা,' রবিন বলল। 'সুড়ঙ্গের দেয়ালের সাঙ্কেতিক লেখা ওরা দেখেনি, আমরা দেখেছি। ক্যাসেলের কাছে টাওয়ারে গুপ্তধন থাকতে পারে, এ খবরও ওদের জানার কথা নয়। কিন্তু আমরা জেনে বসে আছি।'

আশা বাড়ল ওদের। ভাবল, সবগুলো সাঙ্কেতিক চিহ্নের মানে বের করতে পারলে গুপ্তধন উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা হয়েও যেতে পারে।

বাড়ি ফিরে দুপুরের খাওয়া সেরে আবার বেরিয়ে পড়ল ওরা। ওয়াচ টাওয়ারে যাবে।

তেমন আহামরি কিছু নয় টাওয়ারটা। অবশ্য মিস্টার হেমিঙ সেকথা আগেই বলে দিয়েছেন। ওটার কাছে এসে সাইকেল থেকে নামল ওরা।

'ক্যাসেলের সমান বয়েস এটার,' জিনা বলল।

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'তবে পরে মেরামত করাতে অনেক নতুন লাগছে। চলো, ভাল করে দেখি।'

'ভেতরে ঢুকব?' জানতে চাইল মুসা।

'আগে বাইরেটা তো দেখি। এসো।'

তবে বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা গেল না। যদি কিছু থেকে থাকে, ভেতরে আছে, সুতরাং ভেতরে গিয়েই দেখা দরকার।

চার

পাথরে তৈরি ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে টাওয়ারের চূড়ার কাছে।

সাঙ্কেতিক লেখায় তীর চিহ্ন এঁকে যা বোঝানো হয়েছে, তাতে মনে হয় একেবারে ওপরে উঠে যাওয়ার কথা বলেছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। অনেক জায়গায় ক্ষয়ে গেছে পাথর, কোথাও কোথাও আলগা হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো সিমেন্ট দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে।

ওঠার সময় ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে সবাই। সাঙ্কেতিক চোখটার কথা মনে রেখেছে। আশা করছে দেয়ালের কোথাও আঁকা দেখতে পাবে। কিন্তু পেল না।

ওদের সঙ্গে রাফিও উঠছে লাফিয়ে লাফিয়ে। সেও নজর রেখেছে, তবে চিহ্ন দেখার জন্যে নয়, পাথরের ফোকরে ইঁদুর আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে।

প্রচণ্ড গরমে ঘামতে ঘামতে ওপরে উঠে এল ওরা। টাওয়ারের চূড়ায় কোন কেবিন নেই, গোল একটা বাটির মত; বাটির নিচটাকে ঝোলা বারান্দা ধরলে, উঁচু ধারটা ঘোরানো রেলিঙ, দেয়াল তুলে দিয়ে তৈরি হয়েছে। একেবারে কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেও নিচে পড়ার কোন ভয় নেই। দেয়ালে একটু পর পর বড় ছিদ্র, মোট বারোটা, লুপহোল বলে এগুলোকে; পুরানো আমলে এ সব ছিদ্র রাখা হত যুদ্ধের সময় ওসবের ভেতর দিয়ে শত্রুর ওপর তীর বা গুলি ছোঁড়ার জন্যে। এত ওপর থেকে ওগুলোর ভেতর দিয়ে তাকালে আশপাশের বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে।

টাওয়ারের ওপরের ওই বাটি তন্ন তন্ন করে খুঁজল ওরা। কিছুই চোখে পড়ল না।

মুসা বলল, 'কই, গুপ্তধনের চিহ্নও তো নেই?'

মুখ বাঁকিয়ে জিনা বলল, 'হুঁহ্, যেন সাজিয়ে রেখে দিয়েছে! এলেই পেয়ে যাবে! এত সহজই যদি হবে তাহলে আজও কেউ খুঁজে পেল না কেন?'

'পেয়েছে কিনা জানছ কি করে? আমার বিশ্বাস, পেয়ে গেছে, অহেতুক কষ্ট করছি আমরা। তার চেয়ে...'

'এই এক দোষ তোমার,' বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর, 'মুহূর্তে নিরাশ হয়ে যাও। আরে বাবা, গুপ্তধন পাওয়া কি অত সহজ নাকি? আগে কি আর খুঁজিনি আমরা? কত কষ্ট করে তারপর বের করেছি। কোনবারেই সহজ হয়নি পাওয়া।'

তার কথা কেড়ে নিয়ে জিনা বলল, 'এবারও হবে না। আমি বলি, আবার খোঁজা উচিত। হয়তো কোন কিছু চোখ এড়িয়ে গেছে।'

সুতরাং আবার খুঁজতে লাগল ওরা। রাফিও খুঁজছে ওদের সঙ্গে। তবে সে গুপ্তধন খুঁজছে না, এটা ঠিক, খুঁজে বেড়াচ্ছে ইঁদুরের গন্ধ। মেঝে আর দেয়ালের প্রতিটি ইঞ্চি ঠুকে দেখল ওরা ফাঁপা আছে কিনা, লুপহোলগুলো পরীক্ষা করল, এমনকি ছিদ্রের কিনারগুলোও খুঁচিয়ে দেখল। কিছু পাওয়া গেল না।

'আমাকে যতই গালমন্দ করতে চাও করো,' মুসা বলল, 'কিন্তু আমি সত্যি আর আশা করতে পারছি না। এখানে পাওয়া যাবে না কিছু।'

'নিরাশ হলে হওগে,' বলে দিল জিনা, 'আমি এর শেষ না দেখে ছাড়ব না। অন্তত মেসেজের মানে বের না করা পর্যন্ত থামছি না।'

'আমার মনে হচ্ছে...' কথা শেষ করতে পারল না কিশোর। মৃদু গরগর শুরু করল রাফি। নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকছে। কেউ আসছে নাকি?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ প্রথম শুনতে পেল মুসা। তার পর অন্য তিনজন। নিশ্চয় কেউ আসছে। সাবধান হয়ে গেল সবাই।

'ওরা আসছে না তো?' ফিসফিস করে বলল জিনা, 'লম্বু আর বাঁটুল চন্দ্র! টের পেল কি করে?'

ওর আশঙ্কা ঠিক। সিঁড়ির মাথায় বেরিয়ে এল দু'জন। ছেলেমেয়েদের দেখে ওরাও অবাক। বেঁটে লোকটা সামলে নিল আগে। হেসে বলল, 'আরি আরি, কাকে দেখছি!'

'হ্যাঁ, আমাদেরই দেখছেন!' ঝাঁজাল কণ্ঠে জবাব দিল জিনা।

গোয়েন্দারা কেউ খুশি না হলেও রাফি হলো। আনন্দে দুইবার খেঁকখেঁক করে লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে গেল লোকটার দিকে।

জিনার রাগ গায়ে মাখল না লোকটা। পকেট থেকে চিনির টুকরো বের করে রাফির নাকের কাছে ধরে বলল, 'বল্ তো ব্যাটা কে খাবে?' নিজেই জবাব দিল, 'রাফি খাবে! এই নে!' বলে টুকরোটা ফেলে দিল রাফির সামনে।

সেও লোভীর মত লুফে নিল।

কুকুরের সঙ্গে খাতির করেও আর জিনার মন ভোলাতে পারল না লোকটা। তার ভাঁড়ের মত হাসি পিত্তি জ্বালিয়ে দিল ওর, পারলে তাকে মেরেই বসে জিনা। অনেক কষ্টে সামলে নিল।

'তারপর খোকাখুকুরা?' গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল লম্বা লোকটা, 'টাওয়ারে চড়ে হাওয়া খেতে এসেছ? নাকি চারপাশের

প্রকৃতি দেখছ?'

'দেখা শেষ!' গলার ঝাঁজ কমাতে পারল না জিনা। 'এবার আপনাদের পালা! যত ইচ্ছে দেখুন! অ্যাই, রাফি, আয়!' গটমট করে সিঁড়ির দিকে এগোল সে।

তাকে অনুসরণ করল তিন গোয়েন্দা।

কয়েক ধাপ নামতে কানে এল লম্বা লোকটা বলছে, 'ভীষণ বদমেজাজী মেয়ে!'

রাগে মুখ লাল হয়ে গেল জিনার। ঘাবড়ে গেল তিন গোয়েন্দা, এখুনি ফিরে গিয়ে না একটা ঝগড়া বাধিয়ে দেয়। কিন্তু গেল না জিনা। আরও জোরে পা ফেলে ফেলে নেমে চলল নিচে।

গোড়ায় নেমে বেরিয়ে এসে ওপর দিকে তাকাল ওরা। রেলিঙের কিনারে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে চেয়ে আছে লোকগুলো। দূর থেকেও ওদের চেহারার ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল হাসি উধাও হয়েছে, তার জায়গায় ঠাঁই নিয়েছে রাগ।

মন-মেজাজ খারাপ করে বাড়ি ফিরল ওরা। তবে টেবিলে সাজানো খাবারের বহর মুহূর্তে মুসার রাগ ধুয়ে পানি করে দিল। কিশোর আর রবিনও খাওয়ায় মন দিল। পারল না কেবল জিনা। রাফিকে ধমক দিয়ে বলল, 'তোকে আর আমি কিচ্ছু খেতে দেব না! পাজির হাড্ডি, এত খাওয়া খাস, তাও লোভ যায় না, যে যা দেয় তাই গিলতে শুরু করে!'

বকা খেয়ে কাঁচুমাচু হয়ে লেজ গুটিয়ে ওর পায়ের কাছে বসে পড়ল বেচারা রাফিয়ান।

খাওয়া শেষ করে মুসার পরামর্শে সৈকতে রওনা হলো ওরা। ওর ধারণা, খানিকটা সাঁতার ওদের মন ভাল করে দেবে।

ঠিকই বলেছে সে। সাঁতারের পর জিনারও উত্তেজনা আর রাগ চলে গেল। গরমও কম লাগছে এখন।

বেলা শেষ। পশ্চিমের আকাশকে রাঙিয়ে দিয়ে ডুবছে আগস্ট মাসের বিরাট লাল সূর্য। ঘরে ফেরার আগে শেষবারের মত পানিতে ছোঁ দিয়ে দিয়ে মাছ শিকার করছে কয়েকটা গাল।

একটা বালির ঢিবিতে এসে বসল ওরা। কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'রবিন, কাগজটা আছে না পকেটে?'

শার্ট খুলে রেখেছে রবিন। তুলে নিয়ে পকেট থেকে কাগজটা বের করে দিল। 'সঙ্কেতের মানে বের করার চেষ্টা করবে নাকি?'

'করব।'

'আচ্ছা, এই চোখটা কি বোঝায়, বলো তো?'

'আর কি,' বলে দিল মুসা, 'শয়তানের চোখ। গুপ্তধনের কাছে শয়তান পাহারায় রয়েছে।'

হাসল কিশোর, 'কোথায় পাহারায় আছে, সেটাই আমি জানতে চাই।'

জিনা বলল, 'আচ্ছা, লম্বু আর বাঁটুল টাওয়ারের খবর পেল কি করে? নিশ্চয় কোনভাবে সাঙ্কেতিক লেখাটা ওদের চোখে পড়েছে। আমাদের মতই খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে হাজির হয়েছে টাওয়ারে।'

'তারমানে ওদের থেকে এক পয়েন্ট এগিয়ে নেই আমরা,' রবিন বলল, 'সমানে সমানে রয়েছি। কিশোর, চোখটা দিয়ে বোঝানো হয়নি তো—যেই গুপ্তধন খুঁজতে এসে থাকো, সাবধান থেকো? দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর জন্যেও হতে পারে। হয়তো বলছে এদিকে নজর দাও।'

'কোন দিকে?'

'পরের চিহ্নগুলোর দিকে···ছোট ছোট দাগ···কি বুঝিয়েছে? বারোটার মধ্যে একটা আবার কেটে দিল কেন?'

'ভুলে একটা বেশি দিয়ে ফেলেছিল, কেটে দিয়েছে; তারমানে এগারোটাকে ধরতে বলেছে,' মুসা বলল। 'কিন্তু ধরে করবটা কি? কি বুঝব?'

নিচের ঠোঁটে দু'বার চিমটি কাটল কিশোর। হঠাৎ বলে উঠল, 'কেটে বাদ দিয়েছে বলে মনে হয় না, বাদ দিতে চাইলে শেষটাকে কাটত। বেশি হয়ে গেলে তুমি কি করতে? শেষটাকেই কাটতে না? নাকি মাঝখান থেকে ঘ্যাচ করে একটাকে কেটে দিতে?'

মুসা বলল, 'আমি ওসব আঁকতেই যেতাম না, কে পাগলামি করে!'

রবিন বলল, 'আমি হলে শেষটাই কাটতাম···'

জিনা বলল, 'আমিও। কিন্তু জিনিসগুলো কি?'

'খুঁটি নয়তো?' মুসা বলল, 'নিশানা রাখার জন্যে পোঁতা হয়েছে কোথাও?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'খুঁটি খুব পলকা জিনিস, অতি সহজে নষ্ট হয়ে যায়। শক্ত কিছু বোঝানো হয়েছে, যেটা বহুদিন টিকবে।'

'তাহলে গাছ?' রবিন বলল।

'তাও না। গাছ হলে দাগগুলোর মাথার কাছে ডালের চিহ্ন আঁকা

থাকত। অন্য কিছু।'

'তাহলে কারখানার চিমনি,' মুসা বলল।

'না, তাও না। একসারিতে বারোটা কারখানা গোবেল বীচে অন্তত খুঁজে পাওয়া যাবে না, এত কারখানা কোথায়?'

চুপ হয়ে গেল মুসা। জবাবের জন্যে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল।

নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত তুলল কিশোর, 'দাঁড়াও, মনে হয় বুঝেছি! টাওয়ারের রেলিঙে লুপহোল আছে কয়টা?'

'বারোটা!' সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল জিনা, মুসা আর রবিন।

'ওগুলোর কোনটাতে লুকানো আছে ভাবছ?' জিনার প্রশ্ন।

'তাহলে দেরি করছি কেন?' তর সইছে না মুসার। 'জলদি চলো আবার টাওয়ারে, দেখি গিয়ে!'

'ওগুলোতে গুপ্তধন লুকানো নেই, রাখা সম্ভব নয়, তবে সূত্র লুকিয়ে রাখা সম্ভব।'

নতুন আশা নিয়ে আবার কাগজটার দিকে ঝুঁকল চারজনে।

রবিন বলল, 'এই আধখানা সূর্যের মানে কি?'

'আমারও তাই প্রশ্ন,' মাথা দোলাল কিশোর। 'মনে হচ্ছে যেন সূর্য উঠছে।'

'কিংবা ডুবছে!'

'হতে পারে।'

হঠাৎ মুসা বলে উঠল, 'ওই লুপহোলগুলোর ভেতর দিয়ে সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্ত দেখতে বলা হয়নি তো?'

ঝট করে ওর দিকে ঘুরল কিশোর। কুঁকড়ে গেল মুসা। ভাবল, উল্টোপাল্টা বোকার মত কিছু বলে ফেলেছে, একটা ধমক খেতে হবে। কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে তুড়ি বাজাল কিশোর, 'ঠিক বলেছ তুমি! এটাই বোঝানো হয়েছে! ওই সময় লুপহোলের ভেতর দিয়ে তাকালে নিশ্চয় কিছু চোখে পড়বে। আবার যেতে হবে টাওয়ারে।'

'ইস্,' আফসোস করে বলল জিনা, 'আরেকটু আগে বুঝতে পারলে আজই যেতে পারতাম! সূর্যটা তো ডুবে গেল!'

'কাল ভোরে উঠে যেতে হবে আরকি,' মুসা বলল।

'কিন্তু রাতটা কাটাব কি করে?' উত্তেজনা দমন করতে পারছে না জিনা।

'গুপ্তধনের স্বপ্ন দেখে দেখে,' ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল মুসা, জটিল একটা সঙ্কেতের সমাধান করে ফেলে খুব খুশি, অসাধ্য সাধন করেছে বলে মনে হচ্ছে তার।

পাঁচ

রাতে উত্তেজনায় ভাল ঘুম হলো না একজনেরও। ভোরে উঠতে তাই দেরি করে ফেলল। অন্ধকার থাকতে আর ওঠা হলো না। সবার আগে জাগল জিনা, সূর্য না উঠলেও জানালায় তখন প্রচুর আলো। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে ছুটল তিন গোয়েন্দাকে জাগাতে। সময়মত টাওয়ারে চড়তে না পারলে আবার চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। তারপরেও কথা আছে, যদি আবহাওয়া ভাল না থাকে? যদি বৃষ্টি নামে? সূর্য দেখা না যায়?

তাড়াহুড়া করে সাইকেল বের করে নিয়ে রওনা হলো ওরা। গায়ের জোরে প্যাডাল ঘুরিয়ে চলল। বার বার তাকাচ্ছে পুবের আকাশের দিকে। বুকের মধ্যে কাঁপছে, এই বুঝি উঠে যায় সূর্য!

টাওয়ারের গোড়ায় যখন পৌঁছল ওরা, অনেকগুলো সোনালি আলোর বর্শা দিগন্তে ছুঁড়ে দিয়েছে তখন সূর্য।

'জলদি করো!' হ্যাঁচকা টানে সাইকেল স্ট্যাণ্ডে তুলে সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল কিশোর।

পুরানো সিঁড়ির পাথর খসে পড়ার ভয় আছে, কেয়ার করল না ওরা, দুড়দাড় পা ফেলে ওপরে উঠে এল। রেলিঙের পুব ধারে সারি দিয়ে দাঁড়াল। নাক বরাবর তাকাল যতদূর চোখ যায়। এমনকি রাফিও কিছু না বুঝেই সামনের পা তুলে দিয়ে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে নাক ঢুকিয়ে দিল লুপহোলের ভেতর, সে-ও দেখতে চায়।

বেরিয়ে এসেছে সূর্যের একটা ধার। ওপরে উঠছে ক্রমশ। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে আধখানা হয়ে গেল, ছবিতে যেমন আছে। যতই উঠছে ততই বাড়ছে তেজ আর উজ্জ্বলতা। খালি চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকা অসম্ভব।

চোখ মিটমিট করতে করতে মুসা বলল, 'কি আর দেখব, চোখ তো

আন্ধা হয়ে গেল।'

সূর্য পুরোপুরি উঠে আসা পর্যন্ত অনেক কষ্টে পুবদিকে তাকিয়ে রইল জিনা। তারপর চোখ ফেরাল। 'কিছুই তো দেখলাম না।'

কিশোর বলল, 'সূর্যাস্তের সময় আসতে হবে। তখন হয়তো দেখা যাবে কিছু।'

'কি জানি,' মাথা চুলকাল মুসা, আবার নিরাশ হয়ে যাচ্ছে। 'যদি কিছু দেখা না যায়?'

'না দেখলে বুঝব কি করে? আজ বিকেলেই আসব আবার,' কিশোর বলল। 'এখন লুপহোলগুলো আরেকবার দেখে ফেলি, এসো।'

'কয়বার তো দেখলাম।'

'দেখেছি। আবারও দেখব। কোন সূত্র মিস করেছি কিনা কে জানে। মন বলছে, কিছু একটা আছে এগুলোর মধ্যে।'

'কি থাকতে পারে?' রবিনের প্রশ্ন।

'জানি না। পেলেই তখন বুঝব। এসো, দেখো সবাই।'

দেখতে দেখতে বলে উঠল রবিন, 'এই কিশোর, দেখে যাও!'

হুড়াহুড়ি করে এল সবাই। একটা লুপহোলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। দেখাল অতিরিক্ত খসখসে হয়ে আছে হোলের ভেতরের দিকের গা; বাইরের দিকটা কিংবা অন্য ফাঁকগুলো এত খসখসে নয়। হাত বুলিয়ে না দেখলে বোঝা যায় না। 'আলগা সিমেন্ট লেগে আছে মনে হচ্ছে...'

ভাল করে দেখে কিশোর বলল, 'এগুলো সিমেন্ট নয়, রবিন, একধরনের চুন আর বালির মিশ্রণ, আগের দিনে সিমেন্টের বদলে এ জিনিস দিয়েই বিল্ডিঙের আস্তর করা হত,' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে। 'তবে যে জিনিসই হোক, একটা দুর্দান্ত আবিষ্কার করেছ। সুরকি আর এই মিশ্রণ দিয়ে লুপহোলটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।'

বুঝতে পারল না মুসা। 'তাতে কি?'

'এখনও বুঝলে না? দাগ টেনে আবার কেটে দিয়ে এই হোলটাকেই বোঝানো হয়েছে দেয়ালের লেখায়।'

'তাতে কি লাভ? বন্ধ করার পর আবার খোলা হলো কেন? খোলাটাকে বন্ধ করলেও নাহয় কাটা দাগের একটা মানে হত।'

'বন্ধই ছিল,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'এই হোলটা পশ্চিমে, যেদিকে সূর্য অস্ত যায়। দাগ দিয়ে আবার কেটে

এই হোলের দিকে নজর দিতে বলা হয়েছে, ছিদ্র ভরাট করা সুরকি ভেঙে খুলে এটা দিয়ে পশ্চিমে সূর্যাস্তের দিকে তাকাতে বলা হয়েছে। কিন্তু ভাঙল কেন? মশলা ভাল হয়নি বলে আপনাআপনি খুলে পড়ে গেছে, নাকি টাওয়ার মেরামতের সময় ভেঙে ফেলেছে মিস্ত্রিরা।'

'কিংবা হয়তো সঙ্কেতের মানে বুঝতে পেরে কেউ এটা ভেঙে সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়েছিল,' জিনা বলল।

'তাও হতে পারে,' জবাব দিল কিশোর। 'গুপ্তধনগুলো জায়গামত না পেলে বুঝব কেউ সঙ্কেতের মানে বুঝে ভেঙেছে।' হোলটার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ আরও দু'বার ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। তারপর বলল, 'কিন্তু আরও প্রশ্ন, এত হোল থাকতে দেয়ালের লিখনে এই হোলটাকেই আট নম্বর দেখিয়ে কাটা হলো কেন? টাওয়ারটা গোল, রেলিঙও গোল, এর শেষও নেই, শুরুও নেই—কোনও হোলকে শেষ বা শুরু ধরা যাবে না। যে যেখান থেকে গুণতে শুরু করবে সেটাই শুরু।'

'পশ্চিমে বলেই হয়তো এটাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে,' মুসা বলল।

'এটা একটা পয়েন্ট। কিন্তু আট কেন?' আবার ভাবনায় ডুবে গেল কিশোর। পুরো এক মিনিট পর মুখ তুলল। 'একটা ব্যাপার হতে পারে—এটা দিয়ে একটা বিশেষ মাস বোঝানো হয়েছে। ফুটো মোট বারোটা, বছরের মাসও বারোটা। বছরের সব সময় সূর্য দিগন্তের ঠিক এক জায়গা দিয়ে ওঠে না, ডোবেও না। জায়গা নড়চড় হয়। দাগ টেনে কেটে দিয়ে বোঝানো হয়েছে আট নম্বর ফুটো দিয়ে তাকাতে হবে, একই সঙ্গে আরও বোঝানো হয়েছে বছরের অষ্টম মাসে তাকাতে হবে, অন্য কোন মাসে তাকালে হবে না; যা দেখতে বলা হয়েছে সেটা দেখা যাবে না। কারণ একটাই, সূর্য তখন সরে যাবে।'

তুড়ি বাজিয়ে চিৎকার করে উঠল রবিন, 'ঠিক বলেছ! এটাই জবাব! একেবারে মিলে যাচ্ছে! ভাগ্যিস এটা আগস্ট মাস, একটা মাস পিছিয়ে তদন্ত আরম্ভ করলেই পুরো এক বছর অপেক্ষা করতে হত আমাদের!'

সমাধান পেয়ে গিয়ে আনন্দে হই-চই শুরু করে দিল সবাই। জিনা বলল, 'কখন যে বিকেল হবে!'

'এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে বিকেল হতে অনেক দেরি হবে,' হেসে বলল কিশোর, 'কিছু একটা করা দরকার আমাদের। যাতে দিনটা তাড়াতাড়ি কেটে যায়।'

'এক কাজ করতে পারি,' মুসা বলল, 'এই জিনা, চলো না, তোমার

দ্বীপে চলে যাই। সাঁতারও কাটা হবে, পিকনিক করা হবে…'

'…সময়ও কাটবে!' লাফিয়ে উঠল জিনা। 'দারুণ বলেছ! চলো, চলো!'

বাড়ি ফিরে নাস্তা সেরে মাকে খাবার বানিয়ে দিতে বলল জিনা। জানাল দ্বীপে বেড়াতে যাবে।

প্রচুর খাবার বানিয়ে ঝুড়িতে ভরে দিলেন কেরিআন্টি।

দ্বীপে রওনা হলো গোয়েন্দারা।

হই-হল্লোড় করে, সাঁতার কেটে, খেলে, আর চমৎকার খাবার খেয়ে দিনটা যে কোনদিক দিয়ে পার হয়ে গেল, টেরই পেল না ওরা। বিকেলে ঠিক সময়ে টাওয়ারে পৌঁছার জন্যে বরং তাড়াহুড়ো করতে হলো ওদের।

সময়মতই টাওয়ারে উঠল ওরা। পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়েছে সূর্য। আট নম্বর ফুটোয় থুঁতনি রেখে সূর্যের দিকে তাকাল কিশোর। এখনও যথেষ্ট কড়া, তাকানো যায় না।

ওর দু'পাশ থেকে চেপে এল অন্য তিনজন, সবাই দেখতে চায় লুপহোলের ভেতর দিয়ে কি চোখে পড়ে। উত্তেজনায় কাঁপছে একেকজন। কি দেখতে পাবে? আসলেই কি কোন মূল্যবান সূত্র চোখে পড়বে আধখানা সূর্যের মধ্যে?

দিগন্তরেখা ছুঁলো সূর্যের নিচের প্রান্ত। গাছপালা আর বাড়িঘর ছাড়িয়ে, মাঠ পেরিয়ে ওপাশে সাগরের কিনার থেকে বহুদূরে পানিতে যেন তলিয়ে যেতে শুরু করেছে সূর্যটা। দম বন্ধ করে, চোখ টান টান করে তাকিয়ে আছে গোয়েন্দারা। কি দেখছে ওরা, রাফি জানে না, তবে সেও দেখার জন্যে অস্থির। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সামনের পা তুলে দিয়েছে একটা হোলের গায়ে।

ডুবছে…ডুবছে…লাল গোল থালার মত সূর্যটা দেখতে দেখতে অর্ধেক হয়ে গেল, দেয়ালের ছবিতে যেমন আঁকা আছে।

ব্যাপারটা প্রথম লক্ষ করল কিশোর। তারপর একে একে সবাই। সামনের একটা খামারবাড়ির চূড়া চোখে পড়ছে। বাড়িটার একপাশে একটা ছোট টাওয়ার। একেবারে ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে, লাল সূর্যের পটভূমিতে মনে হচ্ছে কালো কালি দিয়ে আঁকা টাওয়ারওয়ালা একটা বাড়ি।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা, 'দেয়ালের ছবি আর ওটা তো এক!'

কারও কোন সন্দেহ রইল না, ওই বাড়িটার কথাই বলা হয়েছে দেয়ালের লিখনে।

'মনে হচ্ছে গুপ্তধন আমরা পেয়েই যাব!' জিনা বলল।

ওর কথায় উত্তেজনা আঁচ করতে পেরে খেক খেক করে চেঁচিয়ে উঠল রাফি।

'ওই খামারবাড়িতেই আছে নাকি?' মুসার প্রশ্ন। 'কোথায় লুকানো? মাটির নিচে?'

'জানতে হলে গিয়ে দেখতে হবে,' জিনার দিকে তাকাল কিশোর। 'জিনা, বাড়ির মালিককে চেনো নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল জিনা, 'চিনি। খামারটার নাম ব্ল্যাকস্টোন ফার্ম। ছোটবেলায় অনেক দিন মা'র সঙ্গে মাখন কিনতে গেছি ওখানে। আমার ধারণা, ব্ল্যাকস্টোন ক্যাসলের জায়গাই ওটা, নাম দেখো না এক। মালিকের নাম মিস্টার আরমাণ্ড। তাঁর এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় আছে আমার, আমার বয়েসী, নাম তুরিন। ওর ভাইটা ওর দু'বছরের বড়।'

'তাহলে তো খুবই ভাল হলো,' খুশি হয়ে বলল কিশোর, 'তুরিনকে ধরে খুঁজতে যাওয়ার একটা ছুতো বের করা যাবে।'

এখানে যা দেখার দেখেছে। টাওয়ারে আর কোন সূত্র আছে বলে মনে হলো না। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল ওরা। চমৎকার, উষ্ণ একটা বিকেল। নিচে নেমে ঝুড়ির ওপর চোখ পড়তেই খিদে চনমন করে উঠল মুসার। বলল, 'বাকি যা আছে সাবাড় করে দিলেই পারি। অহেতুক বোঝা বয়ে লাভ কি?'

লাভ নেই, বরং লোকসান। খালি পেটে সাইকেল চালাতে কষ্ট হবে। খিদে সবারই পেয়েছে। ঘাসের ওপর বসে পড়ল ওরা।

ছয়

সকালে নাস্তার পর বাগানে এসে বসল সবাই।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'খামারবাড়িতে কখন যাচ্ছি আমরা? ঢোকা যাবে তো?'

'ঢোকাটা কোন ব্যাপারই না,' জিনা বলল, 'পানির মত সহজ। আরমাণ্ডরা গরীব মানুষ। টাকা রোজগারের জন্যে নানা ধান্দা করে। ট্যুরিস্ট সীজনে বিকেল বেলা বাড়িটাকে চায়ের দোকান বানিয়ে ফেলে। বাগানে টেবিল-চেয়ার পেতে চা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে। চা খুব ভাল বানান মিসেস আরমাণ্ড। তবে তাতে তেমন পয়সা আসে বলে মনে হয় না। তুরিন একবার বলেছিল, ওর বাবার নাকি গরুর খামার করার খুব ইচ্ছে। টাকা থাকলে করত। দুধের কারখানা দিত। কিন্তু বেচারা! দু'বেলা খাওয়ার পয়সা জোগাড় করতেই জান খারাপ।'

'তাহলে চা খেতে গিয়ে গুপ্তধনের খোঁজখবর করে আসব আমরা।' মাথা নাড়ল মুসা, 'কিন্তু বিকেল পর্যন্ত যে অপেক্ষা করতে পারছি না?'

'করতে হবে, উপায় নেই। মা বলল, বাজারে যেতে হবে। কিছু জিনিসপত্র লাগবে।'

বাজারে যেতে ভাল লাগে রবিনের, বিশেষ করে গোবেল বীচের হাটে। বলল, 'তাহলে তাই চলো। এখানে বসে থাকতে ভাল্লাগছে না।'

কি কি আনতে হবে তার একটা লিস্ট দিয়ে দিলেন কেরিআন্টি। সাইকেল নিয়ে দল বেঁধে বাজারে রওনা হলো গোয়েন্দারা।

সেদিন গোবেল বীচে হাটের দিন। শাকসব্জি, ফল, ফুল, ডিম, মাখন, রুটি, বিস্কুট, এবং আরও নানা রকম জিনিসে দোকানগুলো ঠাসা। বাইরেও দোকান সাজিয়ে বসেছে অনেকে। এখন ট্যুরিস্ট মৌসুম বলে দোকানগুলোর রমরমার অবস্থা। বাইরে সাজানো একটা দোকানে তুরিনকে দেখতে পেল জিনা। মাখন, ডিম, পনির, ঘরে বানানো রুটি আর বিস্কুট বিক্রি করছে।

'ওই যে তুরিন,' তিন গোয়েন্দাকে দেখাল জিনা, 'ওর ভাইও আছে সঙ্গে। চলো, ওদের দোকান থেকেই কিনি। কথাও বলা যাবে। বিকেলবেলা তোমাদের নিয়ে চা খেতে যাব, এটাও জানিয়ে রাখব।'

তুরিন বেশ সুন্দরী। লম্বা লম্বা চুল। ওর ভাই জকি ওর চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। হাসিখুশি, প্রাণবন্ত ছেলে। চকচকে উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ।

'হাল্লো, জিনা!' জিনাকে দেখে হেসে বলল জকি। 'ওরা তোমার বন্ধু তিন গোয়েন্দা না? দেখেই চিনেছি। রাফি, কেমন আছিস রে?'

ওদের কাছ থেকে ডিম আর মাখন কিনল জিনা। বলল, বিকেলে বন্ধুদের নিয়ে চা খেতে আসবে। শুনে খুব খুশি হলো ভাইবোন।

তুরিন বলল, 'এসো এসো, ভাল হবে। বিকেলের নাস্তার জন্যে স্পেশাল কেক বানাচ্ছে আজ আম্মা। তোমরা এলে জমবে। তখন কথা বলতে পারব।'

খরিদ্দারের ভিড় এখন, কথা বলা সম্ভব না, জিনিসের দাম মিটিয়ে দিয়ে সরে এল জিনা।

বাড়ি ফিরে কেরিআন্টিকে বাজারের ঝুড়িটা দিয়ে সাঁতার কাটতে সাগরে চলল গোয়েন্দারা। গোসল সেরে এসে দুপুরের খাওয়া খেয়ে কাগজটা নিয়ে বসল বাকি সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলোর মানে বের করা যায় কিনা দেখতে।

'ঘর তো পাওয়া গেল,' রবিন বলল, 'কিন্তু পাশের এই তীরচিহ্ন দুটো কি বলতে চায়? দুটোই নিচের দিক নির্দেশ করছে। মাটির নিচে নামতে বলছে? দুটো জায়গার কথা বলছে নাকি?'

'নিশ্চয় খামারবাড়িতে কোন পাতালঘর আছে,' জিনা বলল। 'সিঁড়ি বেয়ে নিচের ভাঁড়ারে নামলে...'

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুসা বলল, 'গুপ্তধন পাওয়া যাবে ভাবছ? মোটেও না। পাব আলু আর ময়দার বস্তা, মিস্টার আরমাণ্ডের মুরগীর খাবারের বাক্স—সাধারণত ভাঁড়ারে যা থাকে। অত সহজ জায়গায় যদি গুপ্তধন থাকত, অনেক আগেই পেয়ে যেত কেউ না কেউ।'

রেগে উঠল না জিনা, ঝগড়াও বাধাল না, ভুরু কুঁচকে মুসার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোমার হয়েছে কি, মুসা, বলতো? আজকাল এত নিরাশার কথা বলো কেন?'

'নিরাশা কোথায়? যা বাস্তব সেটাই বলছি। ভাঁড়ারে থাকলে কি এতদিন থাকত নাকি জিনিসগুলো? তবে মাটির নিচে পোঁতা থাকলে অবশ্য আলাদা কথা।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'আমার তা মনে হয় না। ভাঁড়ারের মাটির নিচে পোঁতা নেই টেম্পলারদের গুপ্তধন। অত সহজ জায়গায় রাখেনি।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার। রবিনের হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়ে আনমনে বলল, 'তাহলে এতদিনে বেরিয়ে যেত ওগুলো। বেরোয়নি যে, এটাও জোর দিয়ে বলা যায়। এ সব কথা চাপা থাকে না, চেপে রাখা যায় না, জানাজানি হয়ে যেত।'

আলোচনা করে বাকি চিহ্নগুলোর কোন সমাধান করতে পারল না ওরা। আরমাণ্ডদের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে উঠল। চায়ের সময় হতে

দেরি আছে এখনও। কিন্তু আর অপেক্ষা করতে পারছে না।

বিকেল চারটায় খামারে পৌঁছল ওরা। বাগানের টেবিলগুলো পরিষ্কার করে কাপ-প্লেট সাজাতে আরম্ভ করেছেন মিসেস আরমাণ্ড। ওরা যে আসবে আগেই মাকে বলে রেখেছে তুরিন আর জকি। গেট খুলে গোয়েন্দাদের ঢুকতে দেখে হেসে এগিয়ে এলেন মহিলা।

মেহমানদের জন্যে প্রচুর খাবার বানিয়েছেন মিসেস আরমাণ্ড। স্কোন, স্ট্রবেরির জেলি, ঘরে তৈরি রুটি, মাখন, নিজেদের পোষা মৌমাছির মধু, বিস্কুট, আর বিশাল এক চকলেট কেক।

দেখে চোখ চকচক করে উঠল মুসার। বলল, 'ভুল বলেছিলাম, জিনা। গুপ্তধন সত্যি আছে আরমাণ্ড ফার্মে। এই যে পেয়ে গেলাম।'

বাগানের কোণে একটা নিরালা টেবিলে গোয়েন্দাদের নিয়ে গিয়ে বসাল তুরিন আর জকি। প্লেটে খাবার তুলে দিল।

অনেক দিন জিনার সঙ্গে দেখা হয় না তুরিনের। গল্পের ঝুলি খুলে দিল। কথায় কথায় বলল, 'এবার গরমে বোধহয় ট্যুরিস্ট খুব বেশি। হোটেলগুলো বোঝাই, কোন বোর্ডারদের বাড়িতেই সীট নেই। আমাদের বাড়িতে এসে উঠতে চাইছে। উঠলে পয়সা পাওয়া যাবে, ঠিক, কিন্তু আম্মার পরিশ্রম বাড়বে ভেবে রাজি হচ্ছিল না আব্বা।'

জকি বলল, 'কিন্তু এমন ধরা ধরল ওরা, শেষ পর্যন্ত রাজি হতে বাধ্য হয়েছে। আজই এসে উঠবে ওরা।'

'ভালই তো,' জিনা বলল, 'সারা বছর তো আর ইনকামের সুযোগ থাকে না। এ সময়টা কিছু বেশি কষ্ট করে যতটা পারা যায় কামিয়ে নেয়াই উচিত। তা ক'জন ওরা? কাচ্চাবাচ্চা আছে নাকি? তাহলেই পড়বে ঝামেলায়।'

তুরিন বলল, 'না, ওসব ঝামেলা নেই। তাহলে যত ধরাই ধরুক, আব্বা রাজি হত না। এরা ভদ্রলোক। গোবেল বীচ নাকি খুব ভাল লেগে গেছে। এখানকার গ্রাম, সাগর খুব নাকি সুন্দর। গ্রাম্য জীবন উপভোগের লোভ হয়েছে। সেজন্যেই কারও বাড়িতে থাকতে চায়। আমাদেরটা খামার বলে বেশি পছন্দ হয়েছে ওদের। আব্বা রাজি হতে না চাওয়ায় পুরো মাসের ভাড়া আর খাওয়ার টাকা অগ্রিম দিয়ে দিয়েছে। বলেছে, যদি অতদিন নাও থাকে, কোন কারণে চলে যায়, তাহলেও টাকা ফেরত দিতে হবে না।'

এত আগ্রহ কেন? হঠাৎ একটা সন্দেহ মাথাচাড়া দিল কিশোরের

মনে। জিজ্ঞেস করল, 'ক'জন ওরা?'

'দু'জন।'

ঝট করে চোখ ফেরাল জিনা, তুরিনের দিকে তাকাল, 'দেখতে কেমন?'

জিনার বিস্মিত হওয়াটা লক্ষ করল না তুরিন। বলল, 'একজন লম্বা, বিশাল শরীর, বড় বড় চুল; আরেকজন তার উল্টো, ছোটখাটো, কেমন করে যেন কথা বলে, ভাঁড়ের মত মনে হয়, হাসি পায়।'

'মিস্টার লম্বু আর মিস্টার বাঁটুল!' বিড়বিড় করল জিনা।

'চেনো নাকি ওদের?' অবাক হলো তুরিন।

'চিনি বললে ভুল হবে,' জবাব দিল কিশোর, 'তবে দু'একবার দেখা হয়েছে, কথাও হয়েছে। জিনা লম্বা লোকটার নাম দিয়েছে মিস্টার লম্বু আর বেঁটেটার মিস্টার বাঁটুল।'

হেসে উঠল জকি, 'ভালই রেখেছে। লম্বাজনের নাম আসলে মিস্টার স্পাইক, আর বেঁটেজনের মিস্টার ককার। বলেছে আজকেই আসবে। রাতের খাবার তৈরি রাখতে বলেছে।'

একে অন্যের দিকে তাকাল গোয়েন্দারা। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল।

চা খাওয়ার জন্যে লোকজন আসতে আরম্ভ করেছে। মিসেস আরমাণ্ড ডাক দিলেন, 'তুরিন, জ্যাক, আয় তো এদিকে। আমি একলা পারছি না।'

মাকে সাহায্য করতে চলে গেল ভাইবোন। রান্নাঘরের পাশের স্টোররুমটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে খাবার রাখার ঘর বানিয়েছেন মিসেস আরমাণ্ড। ওখানে রাখা হয়েছে সমস্ত তৈরি খাবার। লোক এসে বসলে বের করে এনে দেয়া হয়।

খেতে খেতে নিজেদের আলোচনায় মন দিল গোয়েন্দারা।

'এবার বিশ্বাস হচ্ছে তো আমার কথা?' জিনা বলল। 'যা সন্দেহ করেছিলাম। গুপ্তধনের পেছনেই লেগেছে লম্বু আর বাঁটুল। বার বার দেখা হয়ে যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে, যেখানে খুঁজতে যাচ্ছি সেখানেই হাজির হচ্ছে ওরা, এতবার কাকতালীয় ঘটনা ঘটতে পারে না।'

'ঠিক বলেছ,' রবিন বলল, 'কোন ভাবে সুড়ঙ্গের দেয়ালের সাঙ্কেতিক লেখা ওরাও দেখে ফেলেছে। সেগুলোর মানে বুঝে বুঝে এগিয়ে আসছে আমাদের মতই।'

'এবং এই জন্যেই এ বাড়িতে এসে জোর-করে থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছে,' বলল কিশোর, 'যাতে এখানে থেকে গুপ্তধন খুঁজতে পারে। সমস্ত হোটেল আর বোর্ডিং হাউস ভরে যাওয়ায় জায়গা না পাওয়ায় এখানে এসে উঠছে, এটা বিশ্বাস হয় না। এখানে থাকার জন্যে টাকাও খরচ করছে অনেক বেশি। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার।'

মুসা বলল, 'এখানে থাকার ব্যবস্থা করে নেয়ায় আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা পেয়ে যাবে ওরা। যখন-তখন ইচ্ছেমত বাড়ির যেখানে খুশি ঘোরাফেরা করতে পারবে। খুঁজতে সুবিধে হবে।'

টেবিলের ওপর রাখা জিনার হাতের আঙুলগুলো মুঠোবদ্ধ হয়ে গেল। 'সে সুযোগ আমরা ওদের দেব না।'

'কি করবে? আমাদের তো কোন উপায় নেই।'

'আছে। ওদের চেয়ে বেশি সুবিধে পাব আমরা।'

বুঝতে না পেরে জিনার দিকে তাকিয়ে রইল মুসা।

'ভুলে যাচ্ছ, তুরিন আমার বন্ধু,' জিনা বলল। 'ইচ্ছে করলে জকির সঙ্গেও খাতির করে নিতে পারি। ওদেরকে সব কথা খুলে বলব আমরা। যদি বলি, ওদের সীমানায় গুপ্তধন লুকানো আছে, পাওয়া গেলে মালিক হবে ওরাই, পরিবারের জন্যে একটা বিরাট সাহায্য হবে, অবশ্যই আমাদের পক্ষ নেবে ওরা। কোনমতেই আর চাইবে না বাইরের কেউ সেগুলো পেয়ে যাক।'

'তাই তো! এই সহজ কথাটা তো ভাবিনি!' কেন ভাবল না, সেই দুঃখ পুষিয়ে নেয়ার জন্যেই যেন প্লেটে রাখা কেকের বাকি টুকরোটা আস্ত মুখে পুরে দিল মুসা।

জিনার দিকে তাকাল কিশোর, 'সত্যি সব কথা বলতে চাও ওদের?'

'হ্যাঁ। তোমার কি মনে হয়, কোন অসুবিধে হবে?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কিশোর, 'না।'

আর কিছু লাগবে কিনা জানার জন্যে খাবারের ট্রে হাতে ওদের দিকে এগিয়ে এল তুরিন আর জকি।

'না, লাগবে না,' জিনা বলল। 'পাঁচ মিনিট বসতে পারবে?'

জিনাকে গম্ভীর দেখে অবাক হলো তুরিন। 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

'জরুরী কথা আছে তোমাদের সঙ্গে।'

'কি কথা?'

'বসো, তারপর বলছি।'

ভাইয়ের দিকে তাকাল তুরিন। আবার ফিরল জিনার দিকে। ও কতখানি সিরিয়াস বোঝার চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'দাঁড়াও, আসছি। তোমাদের আর কিছু দেব?'

'আমার লাগবে না,' জিনা বলল। তিন গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের?'

হাসল রবিন, 'আমারও লাগবে না। তবে মুসাকে দিতে পারো। পুরো একখান কেক ভরার মত জায়গা নিশ্চয় এখনও আছে ওর পেটে। কি বলো, মুসা?'

জবাবে হেসে সম্মতি দিল মুসা।

আরও কয়েক টুকরো কেক ওর পাতে তুলে দিয়ে চলে গেল তুরিন আর জকি। মিনিট পনেরো পর ট্রে রেখে হাত মুছতে মুছতে ফিরে এল। চেয়ার টেনে বসল। তুরিন বলল, 'হ্যাঁ, এবার বলো কি যেন বলছিলে?'

সব বলা হলো ওদের। শুনে হাঁ হয়ে গেল ভাইবোন। অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না। অবশেষে মুখ খুলল জকি, 'সত্যি ভাবছ এখনও আছে গুপ্তধনগুলো?'

'থাকার সম্ভাবনাই বেশি,' জবাব দিল কিশোর।

তুরিন বলল, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে একমত। আমি তখন অনেক ছোট, আমার নানীর আম্মা তখনও বেঁচে, একদিন এক অদ্ভুত গল্প শুনিয়েছিল আমাকে। তার নানী নাকি বলে গেছে এই এলাকায় প্রচুর গুপ্তধন লুকানো আছে। তবে ঠিক কোনখানে, সেটা জানে না। আরও একটা খবর দিই তোমাদের, আমার নানীর-আম্মার নানীর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক ছিল শোফাইল ডোঁপার।'

'খাইছে!' খাওয়া থামিয়ে দিল মুসা, 'তারম্যানে তোমরা ডোঁপার বংশধর? তাহলে ওই গুপ্তধনের মালিক এখন আইনত তোমরাই।'

জকি বলল, 'নানীর আম্মার মুখে আমিও শুনেছি এই গল্প। বিশ্বাস করিনি। ভাবতাম, কবেকার কোন গুপ্তধন, এখনও পড়ে আছে নাকি।'

'আম্মা আর আব্বাও বিশ্বাস করে না,' তুরিন বলল। 'আমি করি বলে মাঝেমধ্যে আব্বা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে।'

'হাসাহাসির দিন ঘুচল বলে,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল জিনা, 'তোমাদের সাহায্য দরকার এখন আমাদের, ওই গুপ্তধন আমরা খুঁজে বের করবই। তবে ওই দু'জন মেহমান যারা থাকতে আসছে তোমাদের

বাড়িতে, ওদের ঠেকাতে হবে। আমাদের আগেই গুপ্তধন ওরা পেয়ে গেলে আর কিছু করা যাবে না।'

স্পাইক আর ককার কিভাবে গুপ্তধনের খোঁজ পেয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছে, খুলে বলা হলো ভাইবোনকে। সব শুনে কথা দিল ওরা, এ ব্যাপারে অবশ্যই সাহায্য করবে গোয়েন্দাদের।

সাত

সারাদিনই খামার কিংবা ঘরের কাজে বাবা-মাকে সাহায্য করে তুরিন আর জকি। সকালের দিকটায় বেশি কাজ থাকে। ওই সময় ওদের সাহায্য পাওয়া কঠিন। তাই দুপুরে খাওয়ার পর আরমাণ্ড ফার্মে রওনা হলো গোয়েন্দারা।

কাজে ব্যস্ত থাকলেও মনে মনে ওদের অপেক্ষা করছিল ভাইবোন। দেখে খুশি হলো। জকি জিজ্ঞেস করল, 'কোনখান থেকে শুরু করতে চাও?'

'মাটির নিচের ভাঁড়ার,' বলল কিশোর। 'তবে আগে তোমার আব্বার অনুমতি নিয়ে নেয়া দরকার। সব কথা তাঁর জানা থাকলে, এবং তিনি রাজি হলে আমাদের খুঁজতে সুবিধে হবে। কোন রকম লুকোচুরির প্রয়োজন পড়বে না।'

শুনে মুচকি হাসলেন মিস্টার আরমাণ্ড। বললেন, 'খুঁজতে চাও, খোঁজো, তবে পাবে না কিছু। ওসব গুজব।' কাজ করতে চলে গেলেন তিনি।

মনে মনে রেগে গেল জিনা। তুরিন আর জকি সরতেই ফুঁসে উঠল, 'বলার দরকারই ছিল না! পাত্তাই দেয়নি আমাদের কথায়!'

'এতে রাগার কি হলো?' ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল কিশোর। 'কতজনেই তো দেয় না। গুপ্তধনের কথা বললে হাসে। আমরাই কি পুরোপুরি বিশ্বাস করছি, আছে?'

জবাব দিতে না পেরে চুপ হয়ে গেল জিনা। তুরিন ফিরে এলে জিজ্ঞেস করল, 'কথায় কথায় আবার তোমার আব্বা বলে দেবেন না তো স্পাইক আর ককারকে?'

'না না,' মাথা নাড়ল তুরিন, 'বেশি কথা বলা আব্বার স্বভাব না। নিশ্চিন্ত থাকো, বলবে না।'

অনেক পুরানো বাড়ি। একটা নয়, বেশ কয়েকটা ঘর আছে মাটির নিচে। তবে কোনটাই অগোছাল নয়। সব সময় পরিষ্কার করা হয়। জিনিসপত্র সব সাজিয়ে রাখা। এক নজর দেখেই বুঝে গেল কিশোর, এখানে গুপ্তধন নেই। তবু পরীক্ষা না করে নিশ্চিত হতে পারল না। প্রতিটি ঘরের দেয়াল আর মেঝে পরীক্ষা করল, হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে দেখল কোথাও ফাঁপা জায়গা আছে কিনা।

নেই। গুপ্তধন থাকার কোন আলামতই পাওয়া গেল না কোথাও। হতাশ হয়ে মাটির নিচ থেকে উঠে এল ওরা। ধুলায় মাখামাখি হয়ে গেছে শরীর। নাকেও ঢুকেছে। বার বার হাঁচি দিচ্ছে। খুব হতাশ হয়েছে জকি আর তুরিন।

হতাশ হয়েছে মুসাও, বলল, 'কোন লাভ হলো না। বেকার খাটলাম।'

'গুপ্তধন খোঁজা শেষ?' জানতে চাইল তুরিন।

'এত তাড়াতাড়ি,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'কোন কাজে হাত দিয়ে কখনও ব্যর্থ হয়ে ফিরিনি আমরা। শেষ দেখে ছাড়ব। মেসেজে তীরচিহ্ন এঁকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে, নিচে নামতে হবে।'

'ভাঁড়ার তো দেখা হলো। আর জায়গা কোথায়?'

'সবগুলো ভাঁড়ার দেখেছি আমরা? আর একটাও নেই?'

'না।'

'আশেপাশে এমন আর কিছু আছে, যেটা দিয়ে পাতালে নামা যায়? কুয়া বা ওই ধরনের কিছু?'

'আছে!' বলে উঠল জকি। 'অনেক পুরানো দুটো কুয়া আছে। একটা শুকনো, পানি ওঠার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আরেকটাতে পানি ওঠে এখনও, তবে কম, অনেক নিচে থাকে পানি।'

'গুড!' তুড়ি বাজাল কিশোর। 'শুকনোটাতে নেমে দেখব আমরা। দড়ি আর একটা টর্চ হবে?'

এক বাণ্ডিল শক্ত দড়ি আর একটা টর্চ এনে দিল জকি। কুয়াটা দেখিয়ে দিল। আগে কে নামবে সেটাই হলো প্রশ্ন।

মুসা বলল, 'আমি পারব না। কুয়ায় ভূত থাকে। শুনেছি, কুয়ার ভূতগুলো নাকি সাংঘাতিক। এক চীনার কাছে শুনেছি, পুরানো কুয়ায়

নাকি ড্রাগনও থাকে। মানুষ ধরে আটকে রাখে। চাকর বানায়।'

'হুঁ, ভূত আর ড্রাগনের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই,' বলে দড়ির একমাথা খুলে কোমরে পেঁচাতে শুরু করল কিশোর। 'আমিই নামব।'

কুয়ার কাছে বড় একটা গাছে দড়ির অন্য মাথা বেঁধে নিয়ে টর্চ হাতে কুয়ায় নেমে গেল সে। নামার জন্যে কুয়ার দেয়ালে লোহার শিক বাঁকা করে এমন ভাবে গেঁথে দেয়া হয়েছে যাতে সেগুলো ধরে ধরে মইয়ের মত ব্যবহার করে নেমে যাওয়া যায়।

কিছুদূর নামার পর অস্ফুট শব্দ করে উঠল কিশোর। সাদা রঙের একটা তীরচিহ্ন আঁকা রয়েছে দেয়ালে। কিন্তু নিচে নেমে হতাশ হলো। আরও কয়েকটা একই রকম চিহ্ন আঁকা রয়েছে। ভাল করে দেখে বুঝল, ওগুলো এঁকেছে গ্যাস কিংবা পানি সরবরাহকারী সংস্থার লোকেরা। মোটা পাইপ গেছে কুয়ার নিচ দিয়ে। শ্রমিকরা নেমে কাজ করে গেছে এখানে, চিহ্নগুলো ওরাই দিয়ে রেখে গেছে।

একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেল সে, এই কুয়াটার মাটির নিচে গুপ্তধন নেই, পাইপ বসানোর জন্যে খোঁড়া হয়েছে আগেই। এখন আর খুঁড়ে লাভ হবে না। দেয়ালের ওপাশেও আছে বলে মনে হয় না। তবু নিশ্চিত হবার জন্যে কোমরে ঝোলানো হাতুড়ি খুলে নিয়ে ঠুকে দেখতে লাগল ফাঁপা জায়গা আছে কিনা।

নেই।

শুকনো মুখে ওপরে উঠে এল সে। উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে সবাই। কিন্তু ওর মুখ দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল।

দ্বিতীয় কুয়াটায় নামার প্রয়োজন মনে করল না আর কিশোর। টিন দিয়ে ঢেকে রাখা। নিচে পানি। নিয়মিত বালতি দিয়ে এখান থেকে পানি তুলে ঘোড়াকে খাওয়ানো হয়। পানির নিচে গুপ্তধনের সিন্দুক থাকলে অবশ্যই বালতিতে ঘষা লাগত।

ব্যর্থ হয়ে, খালি হাতে বাড়ি ফিরে এল গোয়েন্দারা। তবে হাল ছাড়ল না। পরদিন আবার চলল আরমাণ্ড ফার্মে। মেসেজে যখন এই ফার্মটার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, নিশ্চয় কোন না কোন সূত্র আছেই এখানে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই কিশোরের।

এ বাড়িতে আর কোন্‌খানে গুপ্তধন থাকার সম্ভাবনা আছে এ নিয়ে তুরিন আর জকির সঙ্গে কথা বলছে গোয়েন্দারা, এই সময় পেছনে হাসি শোনা গেল। স্পাইক আর ককার এসে হাজির হয়েছে।

'তাহলে গুপ্তধন খুঁজছ তোমরা, না?' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল বেঁটে ককার। 'ভাল, খুব ভাল। তবে গুপ্তধন খোঁজায় বিপদ আছে, এটা ভুলে যেয়ো না।'

'বিপদ আছে' কথাটা এমন করে বলল সে, জিনা বা তিন গোয়েন্দা কারোরই বুঝতে অসুবিধে হলো না, হুমকি দিচ্ছে। পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল ওরা।

লোকগুলোর ভাবভঙ্গি বোধহয় রাফিরও পছন্দ হলো না। অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাতে লাগল সে। শেষে গরগর করতে শুরু করল। ওদের কাছ থেকে চিনি খাওয়াতেই বোধহয় কামড়াতে গেল না, এইটুকু চক্ষুলজ্জা কুকুরেরও আছে।

আর কিছু না বলে ঘুরে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে হাঁটতে শুরু করল লোকগুলো। ওদের দিকে তাকিয়ে গরগর শুরু করল রাফি। রাগে হাতের আঙুল মুঠোবদ্ধ হয়ে গেল মুসার। 'ব্যাটারা আমাদের কথা শুনে ফেলেছে!'

'ভয় দেখিয়ে গেল আমাদের!' রেগে গেছে জিনাও। 'ভেবেছে কি? ডরাই আমরা!'

চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'যুদ্ধ ঘোষণা করে গেল ওরা। এখন থেকে সাবধান থাকতে হবে আমাদের।'

'কি করবে ওরা?' ফুঁসে উঠল জিনা।

'কেউ কারও ক্ষতি করতে চাইলে অনেক কিছুই করতে পারে, সাবধান হতে দোষ কি? এসো, আমাদের কাজটা সেরে ফেলি।'

আগের দিনের চেয়ে অনেক বেশি সময় নিয়ে, অনেক নিখুঁত ভাবে ভাঁড়ারগুলোতে খুঁজল ওরা। কিন্তু অযথা সময় নষ্ট। কিছুই পাওয়া গেল না। দুপুরবেলা তুরিনদের বাড়িতেই লাঞ্চ সারল। খাবারের দাম মিটিয়ে দিয়ে। জোর করেই দিল, নিতে চাইলেন না মিসেস আরমাও। তবে বিকেল বেলা চায়ের সময় হলে ট্রেতে করে খাবার এনে দিয়ে বললেন, 'এটা আমার তরফ থেকে। এর জন্যে যদি পয়সা দিতে চাও, সত্যি রাগ করব। ভাবব, গরীব আন্টিকে অপমান করছ।'

এরপর আর কথা চলে না।

কাপে চা ঢেলে দিতে দিতে মিসেস আরমাও বললেন, 'মনে হচ্ছে ফার্মটা তোমাদের খুব ভাল লেগেছে। তা অবশ্য লাগারই কথা। প্রচুর খেলার জায়গা। দু'দিন তো ভালই কাটালে। কাল থেকে বোধহয় আর

পারবে না। তুরিন আর জকি থাকতে পারবে না।'

'কোথায় যাবে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল জিনা।

'আর্চিলদের ফার্মে কাজ করতে। ডেইরির কাজ ভাল পারে ওরা, বাপের সঙ্গে কাজ করে করে শিখে গেছে। তুরিনের আব্বা বলল, স্কুল যখন ছুটি, বাড়িতে বসে থেকে লাভ কি, কাজ করলে দুটো পয়সা আসে। বলতে লজ্জা নেই, সময় খুব খারাপ যাচ্ছে আমাদের। খাটতে খাটতে শেষ হয়ে যাচ্ছে বেচারা মানুষটা! চার-চারজন লোকের খাবার জোগাড় করা, সোজা কথা নয়!'

'কিন্তু তুরিন বা জকি তো কিছু বলেনি আমাদের?'

'ওরা এখনও জানে না। খানিক আগে ওদের আব্বা বলল আমাকে। শুরুতে ওর অবশ্য মত ছিল না। ভেবেছিল, ছেলেমেয়েগুলো স্কুল ছুটি পেয়েছে, খানিকটা খেলাধুলা করে কাটাবে। এমনিতে তো কম খাটে না। সারাক্ষণই হয় ওর আব্বাকে সাহায্য করে, নয়তো আমাকে। আর্চিলরা ক'দিন থেকেই বলছে, কিন্তু ওর আব্বা কান করেনি, কিন্তু আজ ওকে ভালমত বুঝিয়েছে আমাদের দুই মেহমান...'

'স্পাইক আর কক্কার!'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস আরমাণ্ড। 'বড় ভাল লোক দু'জনেই। মানুষকে বোঝানোর ক্ষমতা আছে। নইলে তুরিনের আব্বাকে যে ভাবে রাজি করিয়ে ফেলল...ওরা বলল গাঁয়ের খামারে কাজ করার শখ ওদের অনেক দিনের। তুরিনের আব্বার সঙ্গে কাজ করতে চাইছে। তাতে পয়সা দেয়া লাগবে না আমাদের, বিনে পয়সায়ই খেটে দেবে, শখে। সুতরাং ছেলেমেয়ে দুটোকে অন্যত্র কাজে পাঠালে কোন অসুবিধে নেই, বরং লাভই হবে, নগদ পয়সা আসবে।'

'ভাল না ছাই!' আরেকটু হলেই বেরিয়ে যাচ্ছিল জিনার মুখ দিয়ে।

চা খেতে লোক আসতে আরম্ভ করেছে। ওদেরকে চা দেয়ার জন্যে চলে গেলেন মিসেস আরমাণ্ড।

'কি বুঝলে!' বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল জিনা। 'শয়তান দুটো...'

'আস্তে বলো!' হুঁশিয়ার করল কিশোর। 'কারও কানে যাবে!'

'শয়তান দুটো চালাকি করে তুরিন আর জকিকে সরিয়ে দিল, যাতে গুপ্তধন খোঁজায় ওরা আমাদের সাহায্য করতে না পারে। ওরা বাড়ি না থাকলে আমরাও কোন ছুতো পাব না আসার।'

'বদমাশ দুটোকে ধরে কিলানো দরকার!' মুসা বলল। ঝালটা মেটান

একটুকরো রুটির ওপর। দলামোচড়া করে মুখে পুরে জোরে জোরে চিবাতে শুরু করল।

'দাঁড়াও, সময় আসবে কিলানোর,' কঠিন স্বরে বলল কিশোর। 'আমরাও ছাড়ব না···'

আট

পরদিন সকালে উঠে আর কোন কাজ খুঁজে পেল না ওরা। মুসা বলল, সাঁতার কাটতে যাবে। তবে তারও আজ সাঁতারের মুড নেই, রহস্য হাতে পেয়ে সেটার কিনারা করতে না পারলে জেদ চেপে যায়। গুপ্তধন খোঁজায় শুরুতে যদিও তার অতটা আগ্রহ ছিল না, স্পাইক আর ককার বাধা দেয়ায় খেপে গেছে।

জিনা বলল, 'বসে থাকার চেয়ে বরং বুড়ো জেলেদের সঙ্গে আলাপ করিগে চলো। ওরা অনেক কিছু জানে। একেক সময় এমন সব গল্প বলে, থ হয়ে যেতে হয়।'

একমত হয়ে কিশোর বলল, 'মন্দ বলোনি। আরমাণ্ডদের কথাও জিজ্ঞেস করব ওদের। বাড়িটার আশেপাশে মাটির নিচে কোন সুড়ঙ্গ আছে কিনা, জানার চেষ্টা করব।'

বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে সারাদিনের জন্যে বেরোল ওরা। কিন্তু কোন লাভ হলো না। চেনাশোনা জেলে বা নাবিক বা ভবঘুরে যাকেই পেল, খাতির জমাল জিনা, নানা প্রশ্ন করল, কিন্তু টেম্পলারদের গুপ্তধন উদ্ধারে কাজে লাগে এমন কোন তথ্য বের করতে পারল না।

তবে দমল না ওরা। পরদিন আবার চেষ্টা করল। লাভ হলো না। তার পরদিন আবার। সেদিনও তথ্য পেল না বটে, তবে এমন একটা ঘটনা ঘটল, পরিস্থিতি নতুন মোড় নিল।

সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরছে ওরা। সাইকেল চালিয়ে আগে আগে চলেছে রবিন। একজায়গায় ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে গেছে সরু পথ। ভাল রাস্তা আছে, কিন্তু এটা শর্টকাট, তাড়াতাড়ি হয় বলে এদিক দিয়েই বেশি চলাফেরা করে ওরা। অন্ধকার হয়ে এসেছে। হঠাৎ কিসে যেন চাকা বেধে গেল সাইকেলের। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল। একহাতে ঢিল

করে হ্যাণ্ডেল ধরে রেখেছিল রবিন, সামলাতে পারল না, প্রায় ডিগবাজি খেয়ে উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়ল। কি হলো! কি হলো! তাড়াহুড়ো করে সাইকেল রেখে ওর কাছে ছুটে এল সবাই।

কতগুলো বিছুটির মধ্যে পড়েছে রবিন। কিন্তু গা চুলকানোর বদলে ব্যথায় গোঙাচ্ছে।

কি হয়েছে? উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল সবাই।

'পাটা বোধহয় গেছে আমার!' বাঁ পায়ের গোড়ালি চেপে ধরে আছে রবিন।

'কই, দেখি?' রবিনের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ওর হাতটা সরিয়ে দিল মুসা।

শক্ত ব্যথা পেয়েছে রবিন। ফুলে উঠেছে জায়গাটা। নীল হয়ে যাচ্ছে।

টিপ দিল মুসা।

ব্যথায় জোরে চিৎকার করে উঠল রবিন।

মাথা ঝাঁকিয়ে মুসা বলল, 'ভাঙেনি, মচকেছে। হাঁটতেই পারবে না এখন, সাইকেল চালানো তো দূরের কথা। নাও, আমার কাঁধে ভর দিয়ে ওঠো, নিয়ে যাই।'

'হ্যাঁ, চলো,' জিনা বলল, 'মা ভাল পানিপট্টি দিতে জানে। দেখবে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যথা কমে যাবে।...কিশোর, তুমি ওখানে কি করছ?'

'দেখে যাও,' হাত নেড়ে ডাকল কিশোর।

এগিয়ে গেল জিনা আর মুসা।

একটা স্টিলের তার দেখাল কিশোর। একমাথা বাঁকা হয়ে পড়ে আছে পথের ওপর। অন্য মাথাটা বাঁধা একটা গাছের সঙ্গে। যে মাথাটা পড়ে আছে সেটাও বাঁধা ছিল আরেকটা গাছের সঙ্গে, টান লেগে খুলে এসেছে।

'কি বুঝলে?' ওদের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কিশোর।

'খাইছে! কেউ বেঁধে রেখেছিল!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার।

'অ্যাক্সিডেন্ট ঘটানোর জন্যে!' জিনা বলল। 'আমি শিওর, লম্বু আর বাঁটুল! ওরা জানে আমরা এ পথ দিয়ে বাড়ি যাই।'

'কিন্তু কেন? আমরা অ্যাক্সিডেন্ট করলে ওদের কি লাভ?' মুসার প্রশ্ন।

'তাহলে আর গুপ্তধন খুঁজতে বেরোতে পারব না। ভয় পেয়ে আমরা

পিছিয়ে গেলে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবে ওরা।'

'শয়তানিটা ওরা ছাড়া আর কেউ করেনি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'নইলে পথের ওপর তার বেঁধে রাখবে কে? আমরা যাতে খোঁজা বন্ধ করি, সেজন্যে প্রথমে হুমকি দিল। তাতে কাজ না হওয়ায় তুরিন আর জকিকে কাজের ছুতোয় সরিয়ে দিয়ে আমাদের ওবাড়িতে যাওয়ার পথ বন্ধ করল। তাতেও দমাতে না পেরে এখন সহিংস পথ বেছে নিয়েছে। এরপর যদি আমাদের খুনও করতে চায়, অবাক হব না। বলেছিলাম না, সাবধান থাকতে হবে আমাদের, ওরা ক্ষতি করবে!'

যাই হোক, ধরাধরি করে রবিনকে বাড়ি নিয়ে আসা হলো। সমস্ত কাজকর্ম ফেলে ছুটে এলেন কেরিআন্টি। ফ্রিজ থেকে বরফের টুকরো বের করে পানিতে ফেলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে পানিপট্টি দিতে লাগলেন রবিনের পায়ে।

রাতে ঘুমিয়ে পরদিন সকালে পায়ের ব্যথা অনেক কমে গেল রবিনের। কিন্তু বিছানা থেকে ওকে নামতে দিলেন না কেরিআন্টি। কড়া হুকুম দিয়ে দিলেন, ব্যথা পুরোপুরি না সারা পর্যন্ত ওর বাইরে বেরোনো তো দূরের কথা, বিছানা থেকে নামাই বন্ধ। নড়াচড়া করলে তাড়াতাড়ি ভাল হবে না পা।

সুতরাং তাকে বিছানায় রেখে তথ্য সন্ধানে বেরোল অন্য তিনজন। অবশ্যই রাফিও রইল ওদের সঙ্গে। খানিকটা জেদ করেই বেরোল ওরা, লম্বু আর বাঁটুলকে দেখানোর জন্যে যে ওদের হুমকিতে ওরা ভয় পায় না, পরোয়া করে না, এমনকি জীবন নাশের হুমকি দিলেও না। আরমাণ্ড ফার্মের কাছেও খানিক ঘোরাঘুরি করে এল।

দিনভর নানা জায়গায় ঘুরে বিকেলে চায়ের সময় বাড়ি ফিরল ওরা। রবিন তখনও বিছানায় শুয়ে। তবে একা একা কাটাতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি তার, বই পড়ে কাটিয়ে দিয়েছে।

ওর বিছানার চারপাশ ঘিরে বসল সবাই। আলোচনা শুরু হলো। প্রসঙ্গ একটাই—গুপ্তধনগুলো কি ভাবে পাওয়া যাবে? রবিনের নকল করে আনা কাগজটা দেখে মেসেজের মানে উদ্ধারের চেষ্টা চলল আরেকবার।

রবিন বলল, 'একা শুয়ে শুয়ে অনেক ভেবেছি। নিচের দিকে নির্দেশ করা তীরচিহ্ন, তার পরের আঁকাবাঁকা রেখা···কি মানে হতে পারে এগুলোর?'

'কি আর, কেঁচো,' রসিকতা করে বলল মুসা, 'কিংবা সাপ। সাপ শিকারের কথা বলেছে ডোঁপা।' হঠাৎ বড় বড় হয়ে গেল চোখ, 'হেই, জিনের কথা বলেনি তো? শুনেছি যক্ষের গুপ্তধন ভরা কলসের গলা পেঁচিয়ে থাকে ভয়ানক বিষধর সাপ। তারমানের সাপের ব্যাপারে সাবধান করে দিতে চেয়েছে ডোঁপা।'

মাঝে মাঝে ওর এই বোকার মত কথা রাগিয়ে দেয় জিনাকে। তবে এখন রাগ করল না। বলল, 'তারচেয়ে বলো গুপ্তধন খুঁজে বের করতে না পারার দুঃখে সাগরে ডুবে মরতে যেতে বলেছে। রেখাটাকে ঢেউ বলে ধরে নিতে অসুবিধে নেই, ঢেউয়ের মতই লাগে।'

উঠে বসল রবিন, 'ঠিক এই কথাটাই ভেবেছি আমি! ঢেউয়ের মতই লাগে! আর ঢেউ ওঠে কোথায়? পানিতে!'

মুসা বলল, 'কিন্তু আরমাণ্ড ফার্মে পানি কোথায়? পুকুর, খাল কিচ্ছু নেই। একটা ডোবাও না।'

'কুয়া আছে। তাতে পানিও আছে।'

'কুয়ার পানিতে ঢেউ ওঠে না।'

'ঢেউ না এঁকে আর কোনভাবে পানি বোঝানোর উপায় নেই।'

জবাবের জন্যে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। জিনাও তাকিয়ে আছে।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। ওদের দিকে তাকাল না। আচমকা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল রবিনের দিকে তাকিয়ে, 'আস্তাবলের পাশের কুয়াটার কথা বলছ?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'হ্যাঁ। পানির নিচে না থাক, দেয়ালের ওপাশে গুপ্তধনের সিন্দুক থাকতে বাধা কোথায়? পানির চিহ্নের পরে যে চিহ্নটা আঁকা হয়েছে, ওটা দেখতে সিন্দুকের মত, দেখো।'

'খাইছে!' চোখ কুঁচকে ফেলল মুসা। 'তাই তো! কিন্তু আমি বাবা নামতে পারব না, আগেই বলে দিচ্ছি। পানিওয়ালা কুয়ায় সিন্দুক, তারমধ্যে গুপ্তধন; ভয়ানক ব্যাপার। অনেক দিন ধরে পড়ে আছে, সিন্দুকটা ভূতুড়ে হয়ে গেলে অবাক হব না। যায় ওরকম। দেয়ালের ভেতর থেকে বেরিয়ে পানিতে নেমে বসে থাকে না, এই গ্যারান্টি কে দেবে? শেষে শেকল দিয়ে পেঁচিয়ে ওখানেই আটকে রেখে দেবে যে নামবে...'

'দূর,' রেগে গেল কিশোর, 'খালি ফালতু কথা...' রবিনের দিকে

তাকাল, 'তুমি বলছ মেসেজে ওই কুয়াটার কথাই বলেছে?'

আবার মাথা ঝাঁকাল রবিন।

জিনা বলল, 'ওর ধারণা ঠিকও হতে পারে। পানি আছে বলে ওই গর্তের মধ্যে দেখার কথা একটিবারও ভাবিনি আমরা। কিন্তু মেসেজে এই আঁকাবাঁকা লাইন এঁকে যে পানিই বুঝিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই আর। কিশোর, দিয়েছি আমরা বাজিমাত করে! বাঁটুলরা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে আমাদের উপকারই করেছে। রবিনের গোড়ালি না মচকালে ওর ব্রেন খুলত না, কুয়ার ব্যাপারও গুরুত্ব দিতাম না আমরা।'

কি করে গর্তে খুঁজতে যাওয়া যায় সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো।

'দিনের বেলা যেতে পারব না,' কিশোর বলল। 'কোন্‌খান থেকে ঘাপটি মেরে দেখে ফেলবে স্পাইক আর ককার ঠিক নেই। রাতে যেতে হবে।'

'তখনও দেখে ফেলার ভয় আছে,' রবিন বলল।

'ওই ঝুঁকিটা নিতেই হবে। তবে তোমাকে বাদ দিয়ে। তোমার গোড়ালি ভাল হতে দেরি আছে। ততদিন অপেক্ষা করাটাও ঠিক হবে না আমাদের। স্পাইকরা সময় পেয়ে যাবে। আজই যাব।'

বাড়িতে থাকতে রাজি হলো না রবিন, গুপ্তধন উদ্ধারের উত্তেজনা মিস করতে চাইল না কোনমতেই। বলল, 'আমি ভাল হয়ে গেছি, দেখো, কোন ব্যথা নেই।' বিছানা থেকে নেমে হেঁটে দেখাল সে।

'কই, খোঁড়াচ্ছ তো,' কিশোর বলল।

'এটুকু তো খোঁড়াবই। তবে হাঁটাহাঁটি করলে আরও ভাল হয়ে যাব। মোট কথা ভাল হোক আর খারাপ হোক, আমি যাব। দরকার হয় গুপ্তধন উদ্ধার করে এসে দশদিন পড়ে থাকব বিছানায়, তাতেও রাজি, কিন্তু আজকে মিস করতে পারব না!'

নয়

অনেক রাতে জিনার বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়লে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরোল ওরা। কালো বা নীল, যার যে রঙের পোশাক আছে পরে নিয়েছে, যাতে অন্ধকারে গা ঢেকে রাখতে পারে। টর্চ আর দড়ি নিল

সঙ্গে। ছাউনি থেকে সাইকেলগুলো বের করে ঠেলে নিয়ে এল গেটের বাইরে। রওনা হলো আরমাণ্ড ফার্মে।

খামারে পৌঁছতে সময় লাগল না। ওখানকার কুকুরগুলো ছেলেমেয়েদের চেনে, এমনকি রাফির সঙ্গেও বন্ধুত্ব আছে, তাই টুঁ শব্দও করল না। রাতের এ সময়ে স্পাইক আর ককার নিশ্চয় বিছানায় ঘুমে অচেতন, খামারের অন্য বাসিন্দাদের মতই, আশা করল গোয়েন্দারা। কুয়াটার কাছে এসে দাঁড়াল।

ফিসফিস করে মুসা বলল, 'ঢাকনাটা সরানো দরকার। আমি এদিকে ধরছি, তোমরা ওদিকটা ধরো।'

সাবধান করল কিশোর, 'শব্দ যেন না হয়।'

ধরাধরি করে কুয়ার ওপর থেকে টিনের ঢাকনাটা সরিয়ে রাখল ওরা। কিনারে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল নিচে। অনেক নিচে পানি। দেয়ালে পাথরের ফাটলের মধ্যে নানা রকম গুল্ম আর লতা জন্মে আছে।

ভাল করে দেখে মুসা বলল, 'দেখো, এটাতেও লোহার আঙটার মই। সহজেই নামা যাবে।'

'তাতে তোমার কি?' খোঁচা দিয়ে বলল জিনা। 'তুমি তো আর পারবে না। বাপরে বাপ, যে কালো পানি!'

'দেখো, রাগিয়ো না বলে দিচ্ছি। তাহলে সত্যি সত্যি নেমে যাব। পানিকে আমি ভয় পাই না।'

'এই তো বীরের মত কথা,' কিশোর বলল। 'নামো, নেমে যাও। তুমি ভয় পেলে অবশ্য আমাকেই নামতে হবে।'

'আমিও নামতে পারি,' জিনা বলল, 'পানিকে আমিও ভয় পাই না।'

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'নামব?'

'নামো। ভয়ের কিছু নেই। তুমি যা ভাবছ, ভূত বা ড্রাগন, ওসব কিছু নেই। সব মানুষের কল্পনা।'

'আর থাকলেই বা কি, দোয়াদরুদ পড়ে নামব,' নিজের মনকে সাহস জোগানোর চেষ্টা করল মুসা। ভয় পেয়ে ও যদি নামতে না পারে, জিনা নেমে যায়, ভীষণ লজ্জার ব্যাপার হবে। কাপড় খুলে নামার জন্যে তৈরি হলো সে।

'আঙটাগুলোতে সাবধানে পা দিয়ো,' কিশোর বলল, 'অনেক পুরানো। ভেঙে না যায়। এক কাজ করো বরং, কোমরে দড়ি পেঁচিয়ে নাও। শিক খসে গেলেও তুমি পড়বে না।'

তাই করল মুসা। লম্বা দড়ির এক মাথা কোমরে বেঁধে নিল। আরেক মাথা আস্তাবলের একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিল কিশোর। ওপর থেকে টর্চ ধরে রাখল জিনা আর রবিন। সেই আলোয় দেখে দেখে সহজেই নেমে যেতে শুরু করল মুসা।

কিছুদূর নেমে মাথা তুলল। সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। এমনকি রাফিও মুখ বাড়িয়ে দিয়ে জুলজুল করে চেয়ে আছে। হেসে বলল মুসা, 'আঙটাগুলো যথেষ্ট শক্ত। কেবল মরচে পড়েছে।'

নামতে নামতে হঠাৎ থেমে গেল সে। কোমর থেকে নিজের টর্চটা খুলে নিয়ে জ্বালল। গর্তের গোল দেয়ালে আলো ফেলে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ দেখার পর আবার ওপর দিকে মাথা তুলে বলল, 'একটা ফোকর আছে এখানে, লতায় ঢাকা। ঢুকে যাওয়া যায়। ঢুকব?'

'ঢোকো,' বলল উত্তেজিত কিশোর।

'সাপটাপ যদি থাকে?' জিনা বলল।

'অত নিচে সাপ নামতে পারবে না।' জিনাকে বলে মুসার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ভয় পাবে? আমি আসব?'

'না, পারব,' জবাব দিল মুসা। কুয়ার দেয়ালের ফোকরে মাথা গলিয়ে দিল সে। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। ওপর থেকে তার সঙ্গীরা দেখল পা দুটোও ঢুকে যাচ্ছে।

সুড়ঙ্গের ভেতরে যে এগিয়ে যাচ্ছে মুসা, সেটা বোঝা গেল দড়ি দেখে, একটু একটু করে ঢুকছে দড়িটাও। একসময় থেমে গেল দড়ি। ওপর থেকে কিশোররা অনুমান করল, কিছু দেখতে পেয়েছে মুসা, কিংবা সামনে আর এগোনোর পথ নেই, তাই থেমে গেছে। অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও যখন বেরোল না মুসা, তাকে সঙ্কেত দেয়ার জন্যে দড়ি ধরে টান দিল কিশোর। ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। কোন টান নেই, খোলা দড়ি, নিশ্চয় বাঁধা নেই মুসার কোমরে।

ভয় পেল তিনজনেই। ভীষণ ভয়। কি ঘটেছে মুসার? কোমরের দড়ি খোলা কেন? ওর নিজের তো খোলার কথা নয়।

মনস্থির করে ফেলল কিশোর, 'আমি নামব!'

আরেক বাণ্ডিল দড়ি আছে সঙ্গে। ওটা খুলে একমাথা কোমরে পেঁচাতে শুরু করল সে। অন্য মাথা খুঁটিতে বেঁধে নামতে যাবে, এই সময় দেয়ালের ফোকরে বেরিয়ে এল মুসার কালো মাথা।

ফোকর থেকে বেরিয়ে শিকের মই বেয়ে ওপরে উঠে আসতে আসতে বলল, 'দড়ি খোলায় ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, না? দাঁড়াও, আসছি, বলব সব। সাংঘাতিক জিনিস দেখে এসেছি।'

'কাজটা তুমি ঠিক করোনি, মুসা,' বকা দিল কিশোর। 'দড়ি খোলার আগে বেরিয়ে এসে আমাদের বলে যেতে পারতে।'

'তাতে সময় লাগত।'

ওপরে উঠে এল মুসা। জানাল, কুয়ার দেয়ালে যে ফোকরটা আছে ওটা আসলে একটা সুড়ঙ্গমুখ। সাগরের পাড়ে গিয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে বেরিয়েছে। সুড়ঙ্গমুখের নিচে পাহাড়ের গোড়ায় একটা গুহা আছে।

'কিন্তু গুহা দিয়ে কি হবে? আমরা চাই গুপ্তধন। ওগুলো কোথায়?' হতাশ মনে হলো রবিনকে। সে আশা করেছিল, এই কুয়ার মধ্যেই কোথাও পাওয়া যাবে ওগুলো। এটা কেন বানানো হয়েছিল, বুঝতে পেরেছে। পানির জন্যে কাটা হয়নি। কুয়ার মত করে বানানো হয়েছে দুশমনকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে। বিপদে পড়লে পালানোর পথ। এ সব কুয়ার কথা বইতে পড়েছে। সেসব দিনে সুড়ঙ্গমুখের মাথায় কুয়া কাটা হত। কায়দা করে বন্ধ করে দেয়া হত মুখটা, কিংবা এমন ভাবে ঢেকে রাখা হত যাতে ওপর থেকে চোখে না পড়ে। নিচে পানি দেখলে সাধারণ কুয়া ভেবে এর মধ্যে আর খোঁজার প্রয়োজন বোধ করত না শত্রুপক্ষ। এ সুযোগে পালিয়ে যেত পরাজিতরা। কিংবা গিয়ে লুকিয়ে থাকত গুহার মধ্যে। সেখানে আগে থেকেই খাবার-দাবার রেখে দেয়া হত, বাস করতে যাতে অসুবিধে না হয়।

'কাছাকাছিই আছে কোথাও,' রবিনের প্রশ্নের জবাবে বলল কিশোর।

'কাছাকাছি কোথায়? নিচের গুহাটায় নয় নিশ্চয়? গুপ্তধন রাখার জন্যে মোটেও আদর্শ জায়গা নয় ওই গুহা। সৈকতে হাঁটতে হাঁটতে যে কেউ ঢুকে পড়তে পারে ওখানে, সিন্দুকটা চোখে পড়ে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল কিশোর, 'তবে মনে হয় গুহার মধ্যে কোন গুপ্তকক্ষ আছে, যাতে সিন্দুক লুকিয়ে রাখা যায়, সহজে কারও চোখে পড়বে না। নইলে মেসেজে দেখানো হলো কেন?'

'ওই গুহাতেই আছে যে শিওর হব কি করে?'

'পাশাপাশি দুটো তীরচিহ্ন আর আঁকাবাঁকা রেখা দেখে। প্রথম তীরটা দিয়ে বোঝানো হয়েছে, কুয়ায় নামো। কুয়ায় নামলেই সুড়ঙ্গমুখ

পাবে। সেটা ধরে এগোলে বেরোবে গিয়ে সাগরের পাড়ে। চোখে পড়বে গুহামুখটা। দ্বিতীয় তীর এঁকে ওটাতে নামার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেউ যাতে দ্বিধায় পড়ে না যায় এর জন্যে আঁকাবাঁকা রেখা এঁকে বোঝানো হয়েছে, নিশ্চিন্তে নামো, এই সাগরের পাড়েই আছে জিনিসগুলো। গুপ্তধনের সিন্দুক তো আর খোলা জায়গায় ফেলে রাখা যায় না, রেখেছে ওই গুহার ভেতরেই।' মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'গুহাটায় ঢুকেছ?'

'না, ঢাল বড় খাড়া, অন্ধকারের মধ্যে নামতে সাহস হয়নি। টর্চের আলোয় মুখটা দেখেছি।'

'আবার দেখলে চিনতে পারবে, যদি বাইরে দিয়ে ঘুরে যাই?'

'পারব। নিশানা দেখে রেখে এসেছি।'

'গুড। তাহলে কাল আর এখানে আসতে হবে না আমাদের। সাগরের দিক দিয়ে গিয়েই গুহায় ঢুকব।'

ক্লান্ত, উত্তেজিত হয়ে অনেক রাতে বাড়ি ফিরল ওরা। চুপি চুপি ঘরে ঢুকল। বেরিয়ে গিয়েছিল যে, এটা টের পাননি কেরিআন্টি। বিজয় হাতের কাছে। বিছানায় শুয়েও উত্তেজনায় ঘুম আসতে চাইল না তাই।

সকালে বেলা করে ঘুম ভাঙল ওদের। তাড়াতাড়ি নাস্তা সেরে বেরিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হলো।

রবিনকে বেরোতে দিতে চাইলেন না কেরিআন্টি। ওর পা যে ভাল হয়ে গেছে, ঠিকমত হাঁটতে পারে, হেঁটে দেখিয়ে প্রমাণ দেয়ার পর ছাড়তে রাজি হলেন তিনি। তবে কথা দিতে হলো, পায়ে চাপ পড়ে এমন কোন কাজ করতে পারবে না সে।

বাইরে বেরিয়ে সৈকতের দিকে হাঁটতে হাঁটতে গুহাটা কোনদিকে মুসাকে জিজ্ঞেস করল জিনা। নিশানাগুলোর কথা শুনে বলল, 'ও, চিনি তো। হাঁটার চেয়ে নৌকা নিয়ে গেলে সুবিধে হবে।'

'তাহলে তাই চলো,' কিশোর বলল।

মুসা বলল, 'কষ্ট তো করছি, গুপ্তধন এখন পেলেই হয়। কেউ বের করে নিয়ে গেছে কিনা কে জানে!'

'দূর, আবার সেই এককথা!' মাছি তাড়ানোর মত করে হাত নাড়ল জিনা। চুপ করিয়ে দিল মুসাকে।

নৌকায় করে উপকূল ধরে এগোল ওরা। দাঁড় বাইছে জিনা আর মুসা। দিগন্ত দেখছে কিশোর। ছোট একটুকরো মেঘ নজরে পড়ল তার।

ছড়াবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তবে প্রচণ্ড গরম পড়ছে। ঝড় আসতেও পারে। রবিনের কোন কাজ নেই, তাই রাফির সঙ্গে বকবক করছে।

'ওই যে গুহাটা, এসে গেছি,' বলে উঠল হঠাৎ জিনা। 'মুসা, ওটাই তো?'

'হ্যাঁ, ওটাই।'

পানির কিনার থেকে উঠে গেছে পাহাড়। ওটার গায়ে পাথরের ছড়াছড়ি। চমৎকার একটুকরো সাদা বালির সৈকতের পর কালো গুহামুখটা যেন হাঁ করে রয়েছে। অনেক ওপরে কালো আরেকটা ফোকর। ওটার চারপাশে পাথর আর লতাপাতা জট পাকিয়ে আছে। জানা না থাকলে কেউ বুঝবে না ওটা সুড়ঙ্গমুখ। মনে হয় অতি সাধারণ একটা গর্ত।

'জোয়ার আসতে এখনও অন্তত দুই ঘণ্টা,' জিনা বলল। 'খোঁজাখুঁজির অনেক সময় পাব।'

'যদি কিছু না পাই?'

'আবারও সেই নিরাশার কথা!'

'হুউ' করে উঠল রাফি। জিনার সঙ্গে একমত নাকি মুসার সঙ্গে, বোঝা গেল না।

বালিতে ঘ্যাঁচ করে ঘষা লাগল নৌকার তলা। লাফিয়ে নামল মুসা। একটা পাথরের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল নৌকাটাকে, যাতে ঢেউয়ে টেনে নিয়ে যেতে না পারে।

একে একে সবাই নামল নৌকা থেকে। টর্চ হাতে গুহায় ঢুকল।

বাইরে থেকে মুখটা দেখলে মনে হয় না গুহাটা অতবড়। বিশাল। মেঝেটা ঢালু হয়ে উঠেছে, ঢুকে গেছে পাহাড়ের ভেতরে বহুদূর।

'এসো, কাজ শুরু করা যাক,' কিশোর বলল।

একেকজন একেক দিকে ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে শুরু করল। কাজটা সহজ না মোটেও। ঢালু মেঝেতে জমে থাকা পিচ্ছিল শ্যাওলা পা ফেলা কঠিন করে দিল।

'জোয়ারের পানি একেবারে ওই মাথা পর্যন্ত চলে যায়,' ঢালু মেঝের শেষ প্রান্ত দেখিয়ে বলল জিনা।

'তারমানে ভরে যায় গুহাটা?' মুসা জানতে চাইল।

মাথা ঝাঁকাল জিনা। 'দেখছ না, কত শ্যাওলা।'

খুঁজতে খুঁজতে গুহার যতটা সম্ভব ভেতরে চলে এল ওরা। জিনা আর

রবিন খুঁজছে নিচের দিকটায়—মেঝে এবং দেয়ালের গোড়ার অংশ, কিশোর আর মুসা ওপর দিকে। মুসা সবার চেয়ে লম্বা, তাই দেয়ালের সবচেয়ে ওপরের অংশে চোখ বোলাচ্ছে সে। পাথরের গায়ে একটা ফাটল দেখতে পেল, মনে হলো ওর মধ্যে সিন্দুক লুকানো যেতে পারে। পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে যতটা পারা যায় ততটা উঁচু হয়েও ফাটলের ভেতরটা নজরে এল না, হাত নেড়ে রবিনকে ডাকল তখন। ওর কাঁধে উঠে গিয়ে দেখতে বলল।

উঠে গেল রবিন। ভাল করে দেখে জানাল ফাটলের মধ্যে কিছু নেই। গোড়ালির ব্যথার কথা ভুলে মুসার কাঁধ থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়ে চোট লাগল আবার। 'মাগ্গোহ্' করে বসে পড়ল ভেজা বালির ওপর। কয়েক মিনিট হাত বুলানো আর টেপাটেপি করার পর ব্যথা কমল।

পাথরের একটা তাকমত দেখতে পেল কিশোর। দু'হাত বাড়িয়ে ওটার কিনার ধরে দোল দিয়ে শরীরটা ওপরে টেনে তুলে ভেতরে তাকাল। দু'চারটা পাথর আছে বটে ওখানে, কিন্তু সিন্দুক নেই।

সময় কাটছে। সিন্দুকটা খুঁজে বের করার সব রকম চেষ্টা চালাল ওরা। অন্য কোন গুহায় যাওয়ার সুড়ঙ্গ আছে কিনা সেটাও খুঁজে দেখল। এ ব্যাপারে রাফির সাহায্য নিল। কিন্তু কোন চেষ্টাই কার্যকর হলো না। পাওয়া গেল না কিছু। শেষে বিরক্ত হয়ে কতগুলো হলুদ কাঁকড়ার দিকে নজর দিল রাফি। একটাকেও ধরতে পারল না। ওর চেয়ে অনেক চালাক প্রাণীগুলো। কাছে গেলেই সুড়ুত করে গিয়ে গর্তে ঢুকে যায়। এত দ্রুত, মনে হয় বিদ্যুতের চমক। ও সরে এলেই আবার মুখ বাড়ায়। যেন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলতে চায়, কচু করবে আমার।

গুহামুখের দিকে এগোতে গিয়ে চিৎকার করে উঠল রবিন, 'সর্বনাশ! জোয়ার এসে গেছে!'

'খাইছে!' চমকে গেল মুসা। 'গুহার মধ্যে পানি ঢুকছে তো! জলদি বেরোও!'

কিন্তু গুহার বাইরে আরও চমক অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। বেরিয়ে দেখে কালির মত কালো হয়ে গেছে আকাশ। সেই ছোট্ট একটুকরো মেঘ যে এত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়বে কল্পনাই করতে পারেনি কিশোর। বড় হয়ে উঠছে ঢেউ, তার মাথায় সাদা ফেনার নাচন। আকাশের এ মাথা-ওমাথা চিরে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল, দশদিক কাঁপিয়ে বাজ পড়ল বিকট শব্দে।

'ইস্, আসার সময় কেন যে ব্যারোমিটার দেখলাম না!' আক্ষেপ করে বলল জিনা।

'ভুল আমরা অনেকগুলোই করেছি,' কিশোর বলল, 'কোনদিকে খেয়াল না রেখে গাধার মত গুপ্তধন খুঁজে বেড়িয়েছি কেবল।'

আবার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল, বাজ পড়ল। বিশাল এক ঢেউ এসে ভেঙে পড়ল, সামনের একটা পাথরের চাঁইয়ে বাড়ি খেয়ে পানি ছিটকে এসে কিশোরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভিজিয়ে দিল। অন্যরাও শুকনো রইল না। তারপর নামল মুষলধারে বৃষ্টি। তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়ার জন্যে যেন তৈরি হচ্ছে প্রবল ঝড়।

'এখনও সময় আছে,' চিৎকার করে উঠল মুসা, 'পালানো দরকার!'

কিন্তু জিনার পায়ে যেন শেকড় গজিয়ে গেছে। নড়ল না, জবাবও দিল না। আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে নৌকাটা যেখানে বাঁধা ছিল সেদিকে। নেই ওটা।

'খাইছে! দ-দ-দ্দড়ি তো শ-শ-শক্ত করেই বেঁ...' তোতলাতে শুরু করল মুসা।

চিন্তিত ভঙ্গিতে সেদিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'এখনও এমন ঝড় কিংবা ঢেউ ওঠেনি যে দড়ি ছিঁড়ে যাবে। হয় বাঁধন খুলে গেছে...'

'অসম্ভব! যে ভাবে পেঁচিয়ে বেঁধেছিলাম, কেউ খুলে না দিলে...'

'মনে হয় সেই কাজটাই করা হয়েছে। খুলে দিয়েছে, নয়তো...' নৌকা বাঁধার পাথরটার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। পাথরে পেঁচানো দড়ির টুকরোটা খুলে নিয়ে মিনিটখানেকের মধ্যেই ফেরত এল। 'এই দেখো, ধারাল অস্ত্র দিয়ে কাটা। ছিঁড়ে গেলে ছেঁড়া জায়গাটা অন্য রকম থাকত।'

'লম্বু আর বাঁটুল!' চিৎকার করে উঠল জিনা। 'ইস্, আজ কত যে বোকামি করলাম! রাফিকে পাহারায় রাখলেও...'

'তাতে লাভ হত না,' কিশোর বলল, 'ওর চিৎকার গুহা থেকে শুনতে পেতাম না আমরা। বরং একদিক থেকে ভালই হয়েছে। ও বাধা দিতে গেলে মার খেত। পিটিয়ে বেহুঁশ করে ফেলত ওকে। মেরে ফেললেও অবাক হতাম না।'

দাঁতে দাঁত চাপল জিনা। 'ওদের আমি ছাড়ব না!'

'ছাড়া না ছাড়া তো পরের কথা,' রবিন বলল, 'আমরা এখন বাঁচি কি করে? যা ঝড় আসছে, নৌকা থাকলেও বাড়ি ফিরতে পারতাম না।

সৈকত ডোবা, হেঁটে যাওয়াও এখন বিপজ্জনক। পানি যে হারে বাড়ছে, একটানে সাগরে নিয়ে যাবে ঢেউ।'

'যাওয়ার জায়গা এখন একটাই আছে,' জিনা বলল, 'গুহার ভেতর।'

'ওটাও তো ডুবে যায়।'

বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে গুহামুখের ভেতরে সরে এল ওরা।

'অ্যাই,' মুসা বলল, 'আরেকটা পথ আছে, সুড়ঙ্গ! আরমাণ্ড ফার্মের কুয়া দিয়ে বেরিয়ে যাব।'

'উচিত হবে না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'নৌকার দড়ি যদি লম্বু আর বাঁটুল কেটে দিয়ে থাকে—আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওরাই দিয়েছে, তাহলে ধরে নিতে হবে ওরা আমাদের ওপর চোখ রাখছে। এমনও হতে পারে, আমাদের গুহায় ঢোকাটা ওরা সন্দেহের চোখে দেখছে না। ভাবছে এমনি ঢুকেছি, পিকনিক করতে। নৌকার দড়ি কেটে দিয়েছে আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে, বোঝানোর জন্যে যে সারাক্ষণ আমাদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে, বাগড়া দিলে, ওদের পথের কাঁটা হলে ভাল হবে না। যদি দেখে কুয়া দিয়ে বেরোচ্ছি, তাহলে বুঝে ফেলবে কোনদিক দিয়ে ঢুকে গুহাটা আবিষ্কার করেছি আমরা, কেন ঢুকেছি। জেনে যাবে গুপ্তধন কোথায় আছে।'

'জানলে জানুকগে, যত খুশি খুঁজতে আসুক, পাবে না কিছুই। গুহায় নেই গুপ্তধন,' হাত নাড়ল মুসা।

'কুয়া দিয়ে নাহয় নাই বেরোলাম,' রবিন বলল, 'সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে বসে তো থাকতে পারি আমরা, যতক্ষণ না জোয়ারের পানি নেমে যায়।'

গুহামুখের ভেতর থেকে সরে গিয়ে ওপরের ফোকরটার দিকে তাকাল মুসা, 'এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে উঠব কি করে ওখানে?'

'উঠতে হবে,' কিশোর বলল, 'এখানে থাকলে মরব।'

'তারচেয়ে গুহায় ঢুকে যাই, চলো।'

'ওখানেও তো অবস্থা ভাল না। পানি ঢোকে। একে জোয়ার, তার ওপর ঝড়; পানিতে গুহা ভরে যদি যায়, দম আটকে মরব।'

অবশেষে সুড়ঙ্গে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। মনে মনে রেগে গেছে জিনা আর কিশোর। জিনা রেগেছে স্পাইক আর ককারের ওপর, তার নৌকার দড়ি কেটে দিয়েছে বলে। আর কিশোর রেগেছে নিজের ওপর, এতটা অসাবধান হওয়ার জন্যে।

'তাড়াতাড়ি করো!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'পানি বাড়ছে কি

ভাবে দেখো!'

সুড়ঙ্গমুখটা অনেক ওপরে, নাগালের বাইরেই মনে হচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে গেছে ঢালের মাটি আর পাথর। খাড়াও বেশ। তার ওপর ঝোড়ো বাতাস প্রচণ্ড গতিতে ধাক্কা মারছে গায়ে। ভয়ঙ্কর করে তুলেছে পরিস্থিতি। এই অবস্থায় উঠতে গিয়ে ওপর থেকে পড়লে আর বাঁচতে হবে না।

তবু ওঠা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছে না ওরা। সাবধানে খুব ধীরে ধীরে উঠে চলল। সবার আগে রয়েছে রবিন, পাহাড়ে চড়ার ওস্তাদ সে। তার পেছনে মুসা। সবার পেছনে রয়েছে কিশোর। পরিশ্রমে হাঁসফাঁস করছে।

সুড়ঙ্গের মুখে পৌঁছে গেল রবিন। কিন্তু আর কেউই পারল না। রবিনের পিছে যে মুসা, সেও অনেক নিচে রয়েছে, কিছুতেই পিচ্ছিল পাথরে আঙুল বাঁধিয়ে আটকে রাখতে পারছে না। ফসকে যাচ্ছে বার বার। বাতাসের ঝাপটায় সোজা হয়েই দাঁড়াতে পারছে না কেউ। জিনা আর কিশোরের অবস্থা আরও কাহিল। রাফি রয়েছে জিনার সঙ্গে। তার অবস্থা অত খারাপ নয়। চেষ্টা করলে ফোকরের কাছে পৌঁছতে পারবে, কারণ নখ আছে তার, পিচ্ছিল মাটিতে বসিয়ে দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারছে।

একসময় হাল ছেড়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'নাহ্, পারব না! আর কোন উপায় নেই, গুহায়ই ঢুকতে হবে। পেছনের দেয়ালের কাছে চলে যাব, অত ওপরে নিশ্চয় পানি ওঠে না। আর যদি ওঠেই, তখন দেখা যাবে।' ওপর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, 'রবিন, তুমি ওখানেই থাকো!'

'না, আমি একা থাকতে চাই না এখানে। তোমাদের সঙ্গে যাব। যা হওয়ার হবে। মরলে সব একসঙ্গে মরব!' আবার নেমে আসতে শুরু করল সে। পারলে ওকে ঠেলে তুলে দিত কিশোর, কিন্তু সেটা অসম্ভব।

নামতে শুরু করল ওরা আবার। নামাটাও কম কঠিন নয়। তাড়াহুড়ো করা যাচ্ছে না, পা হড়কালে শেষ।

অনেক কষ্টে কোনমতে নেমে এসে গুহায় ঢুকল ওরা। এখানেও পানি থই-থই করছে। ওরা গুহার পেছনে সরে আসতে আসতেই বুক পর্যন্ত উঠে এল পানি। বাড়ছে দ্রুত। রাফি অনেক আগে থেকেই থই

পাচ্ছে না। নাকটা উঁচু করে ভেসে রয়েছে। ওর কলার ধরে রেখেছে জিনা। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আর খানিক পর ভেসে থাকার জন্যে সাঁতার কাটতে হবে সবাইকেই। পানি কতটা বাড়বে বোঝা যাচ্ছে না। গুহার ছাতে গিয়ে যদি ঠেকে, দম আটকে মরতে হবে।

থামল না ওরা। পেছনের ঢাল বেয়ে উঠে চলল। গুহার শেষ প্রান্তে চলে যেতে চায়। টর্চ জ্বালতে পারছে না। নোনা পানিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে ব্যাটারি।

'পারব না, বুঝলে!' গলা কাঁপছে মুসার। 'মরব আজ সবাই! তারচেয়ে সময় থাকতে বেরিয়ে গ.ই, দরকার হয় খোলা সাগরে সাঁতার কাটব...'

'মাথা খারাপ নাকি!' কিশোর বলল, 'সাগরের যা অবস্থা, তুমিও ভেসে থাকতে পারবে না, আমাদের কথা তো বাদ...তার চেয়ে যা করছি, করি। এসো।'

আরও এগিয়ে অবস্থার উন্নতি হলো। কোমর পানি এখানে। বেরিয়ে আসতে লাগল পানি থেকে। গুহার শেষ মাথায় এসে দেখা গেল, গোড়ালি পর্যন্ত ডোবে।

তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারল না। বিপদ কাটেনি। পানি এখনও বাড়ছে। ওদেরও আর এগোনোর উপায় নেই। পিঠ ঠেকে গেছে দেয়ালে।

দশ

মরিয়া হয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল কিশোর। চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখো, ওই তাকমত জায়গাটায় উঠে গেলে সময় একটু বেশি পাব।'

জিনা বলল, 'চেষ্টা করলে আমরা উঠতে পারব। কিন্তু রাফি? ও এতক্ষণ পানিতে থাকলে মরবে।'

সমস্যার সমাধান করে দিল কিশোর। তদন্তে বেরোলে প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস থাকে ওর পকেটে। একটুকরো নাইলনের দড়ি বের করে বলল, 'এটা গলায় বেঁধে টেনে তুলব।'

'ফাঁস আটকে মরবে তো!'

'আমরা তাড়াতাড়ি করলে মরবে না। টেনে তুলেই দড়ি খুলে দেব। বেঁচে থাকার জন্যে এটুকু কষ্ট ওকে পেতেই হবে।'

পানি বাড়ছে। সবার আগে মুসাকে উঠতে বলল কিশোর। সে উঠে অন্যদের টেনে তুলবে।

হাত বাড়িয়ে তাকটা ধরে ফেলল মুসা। দোল দিয়ে উঠে গেল ওপরে। তাকের ওপর উবু হয়ে শুয়ে নিচের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ওপর দিকে হাত বাড়াল রবিন। ওকে টেনে তুলল মুসা। দু'জনে মিলে তুলল কিশোরকে। জিনা আর রাফি রইল নিচে। রাফির গলায় দড়ি বেঁধে দিতে বলল কিশোর। দড়ির আরেক মাথা ধরে টেনে তোলা হলো কুকুরটাকে। সবার শেষে উঠল জিনা।

দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে নিচের পানির দিকে তাকিয়ে রইল ওরা।

'এখানে উঠে আসতে কতক্ষণ লাগবে বলো তো?' প্রশ্ন করল রবিন।

'মনে হয় না উঠবে,' আশা করল কিশোর। 'তবু বলা যায় না, জোয়ারের সঙ্গে ঝড় আছে তো…'

ওপর দিকে তাকাচ্ছে জিনা। আরও ওপরে ওঠা যায় কিনা, পথ খুঁজছে। গুপ্তধনের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। এখন একমাত্র চিন্তা প্রাণ বাঁচানোর।

একজায়গায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে না থেকে হামাগুড়ি দিয়ে সরে যেতে শুরু করল জিনা। হঠাৎ পিছলে গেল, গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। জায়গাটা ঢালু। ভয় পেয়ে গেল। গর্তে পড়বে না তো! থাবা মারল বাতাসে। হাতে বাধল একটা গোল পাথর। পতন ঠেকানোর জন্যে প্রাণপণে ওটাই চেপে ধরল। নড়ে উঠল পাথরটা।

অদ্ভুত ঘড়ঘড়ে আওয়াজ কানে এল সবার। তাকিয়ে দেখে একটা পাথরের ফলক সরে যাচ্ছে। বেরিয়ে পড়ল একটা ফোকর। ওপাশে কালো গর্ত।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সবাই। ব্যাপারটা কি? ওপাশে সুড়ঙ্গ, না আরেকটা গুহা?

মুসা বলল, 'চলো, ঢুকি।'

'দাঁড়াও,' বাধা দিল কিশোর, 'আগে দেখি ভেতর থেকে ফলকটাকে খোলা যায় কিনা। ঢোকার পর খুলতে না পারলে আটকা পড়ব।'

মুসাই গিয়ে আগে ঢুকল ওখানে। হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে বের করল

একটা ধাতব হাতল। ফলকটা একটা বিশেষ ধরনের দরজা, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে খোলে, বন্ধ হয়। দু'বার হাতলে চাপ দিয়ে ফলকটাকে খুলল, বন্ধ করল সে। তারপর ডাকল সঙ্গীদের, 'এসো।'

'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ?' ফোকরের ওপাশে সুড়ঙ্গ ধরে এগোতে এগোতে বলল জিনা, 'গুহা আর এই সুড়ঙ্গ পুরোপুরি অন্ধকার হওয়ার কথা। কিন্তু তা নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি।'

'ফসফরাসে ভরা একজাতের শ্যাওলা জন্মে আছে দেয়ালে, দেখো,' কিশোর বলল, 'এর জন্যেই আলো। দেখে শুনে পা ফেলো সবাই, গর্তটর্ত থাকতে পারে।'

নিরাপদেই সুড়ঙ্গ পেরিয়ে আরেকটা গুহায় চলে এল ওরা। পাথুরে ছাতের ফাটল দিয়ে দিনের আলো আসছে। সেই আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে গুহার ভেতরটা। নিচের বড় গুহাটার মত বড় নয় এটা। সমতল মেঝে। গুহার মাঝখানে পড়ে আছে ছোট একটা লোহার সিন্দুক।

'এই সিন্দুকই আঁকা হয়েছে মেসেজে!' চিৎকার করে উঠল জিনা। 'সিন্দুকের ছবির পর যে দুটো সমান্তরাল দাগ দেয়া হয়েছে, ওগুলোর মানেও বোঝা যাচ্ছে এখন—গুহার সমতল মেঝের কথা বুঝিয়েছে। আর আমরা ওদিকে কত জায়গায়ই না খুঁজলাম!'

'পাওয়া তাহলে গেল শেষ পর্যন্ত!' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। 'সত্যি ভেতরে আছে তো জিনিসগুলো?'

পায়ে পায়ে সিন্দুকের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। গায়ে অনেক জায়গায় হালকা মরচে পড়েছে।

'খোলা দরকার!' রবিন বলল।

তালা নেই। ডালা খুলতে অসুবিধে হলো না। খুলে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। সোনা আর রূপার মোহর, নানা ধরনের পাথর—উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে ওগুলো থেকে, সোনার পাত, সুন্দর কারুকাজ করা সোনা-রূপার অলঙ্কার, ধারগুলোতে মূল্যবান পাথর খচিত আয়না, এবং আরও নানা রকম দামী জিনিসে সিন্দুকটা বোঝাই। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

'পাওয়া তাহলে গেল!' বিমূঢ় কণ্ঠে মুসার কথারই প্রতিধ্বনি করল যেন জিনা।

হঠাৎ করেই আনন্দে ফেটে পড়ল ওরা সবাই। ধেই ধেই করে নাচতে আরম্ভ করল রাফি। চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে।

'মিস্টার আরমাণ্ড এবার ধনী হয়ে গেলেন!' রবিন বলল।

'খুশি হবে তুরিন আর জকি!' বলল মুসা।

'নষ্টু আর বাটুল ব্যাটার মুখটা কি হয় দেখতে ইচ্ছে করছে!' জিনা বলল।

ওদেরকে আনন্দ করার সময় দিল কিশোর, তারপর বলল, 'সেসব তো পরের কথা। আগে আমাদের বেরোতে হবে এখান থেকে।'

তাই তো! বাস্তবে ফিরে এল সবাই। ভুলেই গিয়েছিল আটকা পড়েছে এখানে।

তবে দুশ্চিন্তাটা দীর্ঘ হতে দিল না জিনা, 'অসুবিধে নেই, জোয়ারের পানি নামলে সৈকত ধরে হেঁটে বাড়ি চলে যাব।' সিন্দুকের গায়ে চাপড় মেরে বলল, 'ততক্ষণ, এখানে বসে এগুলো দেখেই কাটিয়ে দিতে পারব।'

'কিন্তু আংকেল আর আন্টি খুব চিন্তায় পড়ে যাবেন,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন, 'অনেকক্ষণ বাড়ি ফিরতে পারব না আমরা। সমস্ত জায়গায় খুঁজে বেড়াবেন আংকেল।'

'কিছু করার নেই আমাদের,' মুসা বলল। 'সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পানি নামার জন্যে বসে থাকাই ভাল। তারপর যা হয় হবে।'

মুসার এই দার্শনিক উক্তির পর চুপ হয়ে গেল সবাই।

অবশেষে নামল জোয়ারের পানি। গুহা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। পাথরের ফলকটা আগের মত লাগিয়ে দিয়ে, চাতাল থেকে নিচে নেমে বড় গুহা থেকে বেরোল বাইরে। অনেক আগেই থেমে গেছে ঝড়। বিকেল শেষ। ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। কিন্তু বাড়ি যেতে না পারলে কোনটারই সমাধান হবে না, সুতরাং কষ্ট করে হলেও পা চালাতে হলো। পাহাড়ের গোড়া ধরে এগোল কিছুদূর, একটা মোড় পেরোতে চোখে পড়ল দূরে সৈকতে অনেক লোকের জটলা। আরেকটু কাছে এগিয়ে দেখতে পেল, একটা নৌকাকে ঘিরে জটলা করছে লোকগুলো।

'ওটা তো আমার নৌকাটা!' চিনতে পারল জিনা।

দৌড়াতে শুরু করল ওরা। ভিড়ের মধ্যে লম্বা একজন লোককে চেনা গেল, জিনার বাবা মিস্টার পারকার। পুলিশের একজন ডুবুরির সঙ্গে কথা বলছেন। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন শেরিফ লিউবার্তো

জিংকোনাইশান। সঙ্গে দু'জন পুলিশ।

'বাবা! বাবা!' চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে ছুটল জিনা। 'আমরা এসেছি!'

ফিরে তাকিয়ে ছেলেমেয়েদের দেখে অবাক হয়ে গেলেন মিস্টার পারকার। বিমূঢ় ভাবটা কেটে যেতেই ছুটে আসতে শুরু করলেন তিনিও। কাছে এসে কথার তুবড়ি ছোটালেন সদাগম্ভীর মানুষটা, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ? খুঁজে মরছি আমরা! একজন জেলে গিয়ে খবর দিল, তোর নৌকাটা তীরে উল্টে পড়ে আছে, খালি, ঘাবড়ে গেলাম। তোর মা কান্নাকাটি শুরু করল। আমরা ভাবলাম, ঝড়ে নৌকা উল্টে গিয়ে ডুবে মরেছিস সব।'

'ভালই আছো তোমরা, যাক,' শেরিফ বললেন। 'তা ছিলে কোথায়?'

নৌকাটার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। গলুইয়ের আঙটার সঙ্গে নাইলনের দড়িটা বাঁধা আছে এখনও। ফিরে তাকিয়ে কাটা মাথাটা তুলে ধরে বলল, 'এটা নিশ্চয় দেখেননি, তাই না? কাটা, ছুরি দিয়ে কেটে দেয়া হয়েছে। যে কেটেছে সে জানত, আমরা গুহায় ঢুকেছি, বেরিয়ে এসে যাতে নৌকায় করে বাড়ি ফিরতে না পারি সেজন্যেই এ কাজ করেছে।'

'কি বলছ, কিছু তো বুঝতে পারছি না! কে এই শত্রুতা করল তোমাদের সঙ্গে?'

'মিস্টার লম্বু আর মিস্টার বাঁটুল,' জবাব দিল জিনা।

'কে?'

'ওদের আসল নাম স্পাইক আর ককার,' বুঝিয়ে বলল কিশোর, 'আরমাণ্ড ফার্মে পেইং গেস্ট হয়েছে।'

'ট্যুরিস্ট? ওরা তোমাদের সঙ্গে শত্রুতা করবে কেন?'

'কারণ ওদের মতই আমরাও টেম্পলারদের গুপ্তধনের পেছনে লেগেছি। কোনভাবেই যাতে খুঁজে বের করতে না পারি, সেজন্যে আটকাতে চেয়েছে।'

ভুরু কুঁচকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন শেরিফ। তারপর বললেন, 'ওটা তো গুজব!'

'এখন আর গুজব নয়,' এগিয়ে এল মুসা, 'খুঁজে বের করে ফেলেছি আমরা।'

নৌকার কাছে যারা জটলা করছিল, সবাই এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে

গোয়েন্দাদের। টেম্পলারদের গুপ্তধন পাওয়া গেছে শুনে অবাক হয়ে গেল।

তবে বেশি কথা ছেলেমেয়েদের বলতে দিলেন না মিস্টার পারকার। গাড়ির দিকে ঠেলে নিয়ে চললেন। জিনাকে বললেন, 'তোর মা অস্থির হয়ে আছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি চল। এতক্ষণে কি কাণ্ড করছে কে জানে!'

পুলিশের গাড়িতে করে ওদেরকে অনুসরণ করলেন শেরিফ আর তাঁর দলবল।

ছেলেমেয়েদের নিরাপদে ফিরতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মিসেস পারকার। একই সঙ্গে বকাও দিলেন, আদরও করলেন। চারজনকেই বাথরুমে পাঠিয়ে দিলেন গরম পানি দিয়ে গোসল করে আসার জন্যে। গোসল সেরে, শুকনো কাপড় পরে এসে দেখল ওরা টেবিলে খাবার রেডি। খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রাক্ষসের মত গিলতে লাগল ওরা। খেয়েদেয়ে এসে বসল বসার ঘরে। সব কথা শোনার জন্যে ওখানে অপেক্ষা করছেন শেরিফ।

গুপ্তধন কি করে খুঁজে পেল, সব জানাল গোয়েন্দারা।

'হুঁ, বের করেই ছাড়লে তাহলে,' প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন শেরিফ। 'এখন চলো, গুহাটা দেখাবে, সিন্দুকটা নিয়ে গিয়ে সামলে রাখা দরকার। গাঁয়ের লোকে শুনে ফেলেছে। কে কখন গিয়ে আবার গায়েব করে ফেলে, বলা যায় না।'

'আরও একটা কাজ করতে হবে আপনাকে, আংকেল,' জিনা বলল, 'লম্বু আর বাঁটুলকে অ্যারেস্ট করতে হবে। ওদের শয়তানির শাস্তি হওয়া দরকার।'

কানের গোড়া চুলকালেন শেরিফ। 'কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে তো কোন প্রমাণ নেই আমার কাছে। কিসের অভিযোগে ধরব?'

'আপাতত অ্যারেস্ট করার দরকার নেই,' বুদ্ধি বাতলাল রবিন। 'প্রশ্নটশ্ন করুন, দু'চারটা ধমক দিন, সব বলে দেবে। আমরা তো জানি, শয়তানিগুলো কারা করেছে। চোরের মন পুলিশ পুলিশ। পুলিশ দেখলেই ঘাবড়ে যাবে ব্যাটারা।'

'তা অবশ্য মন্দ বলনি,' মুচকি হাসলেন শেরিফ। 'আচ্ছা, চলো আগে, গুহাটা দেখাও, তারপর ওদের ব্যবস্থা একটা হবে।'

টেম্পলারদের গুপ্তধন দেখার কৌতূহল দমাতে পারলেন না মিস্টার পারকার, তিনিও চললেন সঙ্গে। সিন্দুকটা বের করে আনা হলো। থানায়

সেটা পুলিশের হেফাজতে রেখে সবাইকে নিয়ে আরমাও ফার্মে রওনা হলেন শেরিফ।

রবিন যা অনুমান করেছিল, তাই হলো, পুলিশ দেখেই ঘাবড়ে গেল স্পাইক আর ককার।

ওদের দেখেই গম্ভীর হয়ে গেলেন শেরিফ। বললেন, 'প্রশ্নের আর দরকার নেই, এখনই অ্যারেস্ট করতে পারি ওদের। দু'দিন আগে হেডকোয়ার্টার থেকে একটা ওয়ান্টেড লিস্ট এসেছে, তাতে ওদের নাম আর ছবি পাঠানো হয়েছে। দাগী আসামী দু'জনেই। অনেকদিন থেকে পুলিশ ওদের খুঁজছে। এখানে এসে নাম ভাঁড়িয়ে লুকিয়ে ছিল। স্পাইক আর ককারও ওদের আসল নাম নয়।'

আসামী নিয়ে চলে গেল পুলিশের গাড়ি।

গুপ্তধন পাওয়া গেছে শুনে তো আকাশ থেকে পড়লেন মিস্টার আরমাও। নিজের এতবড় সৌভাগ্যের কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তুরিন আর জকিও মহাখুশি। গোয়েন্দাদের সৌজন্যে একটা পার্টি দেয়ার কথা ঘোষণা করে ফেললেন মিসেস আরমাও।

খুশিমনে বাড়ি ফিরে এল ছেলেমেয়েরা।

রাতে খাবার টেবিলে বসে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জিনা বলল, 'সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা কি জানো, মা, না জেনেই ওদের নাম দিয়েছিলাম আমি মিস্টার লম্বু আর মিস্টার বাঁটুল। সত্যি সত্যি একজনের নাম লম্বু।'

'মানে?'

'মানে, মিস্টার লঙ,' বুঝিয়ে দিল কিশোর।

'ও। তা মজাটা কোথায়?'

'লঙ হলো বেঁটে লোকটার নাম!' হাসতে হাসতে বলল রবিন।

সবাই হাসল, মুসা আর রাফি বাদে, ওরা আইসক্রীম খাওয়ায় ব্যস্ত, মুখ খোলার অবস্থা নেই।

* * *